ইন্টারিমনামা

মো. কিবরিয়া

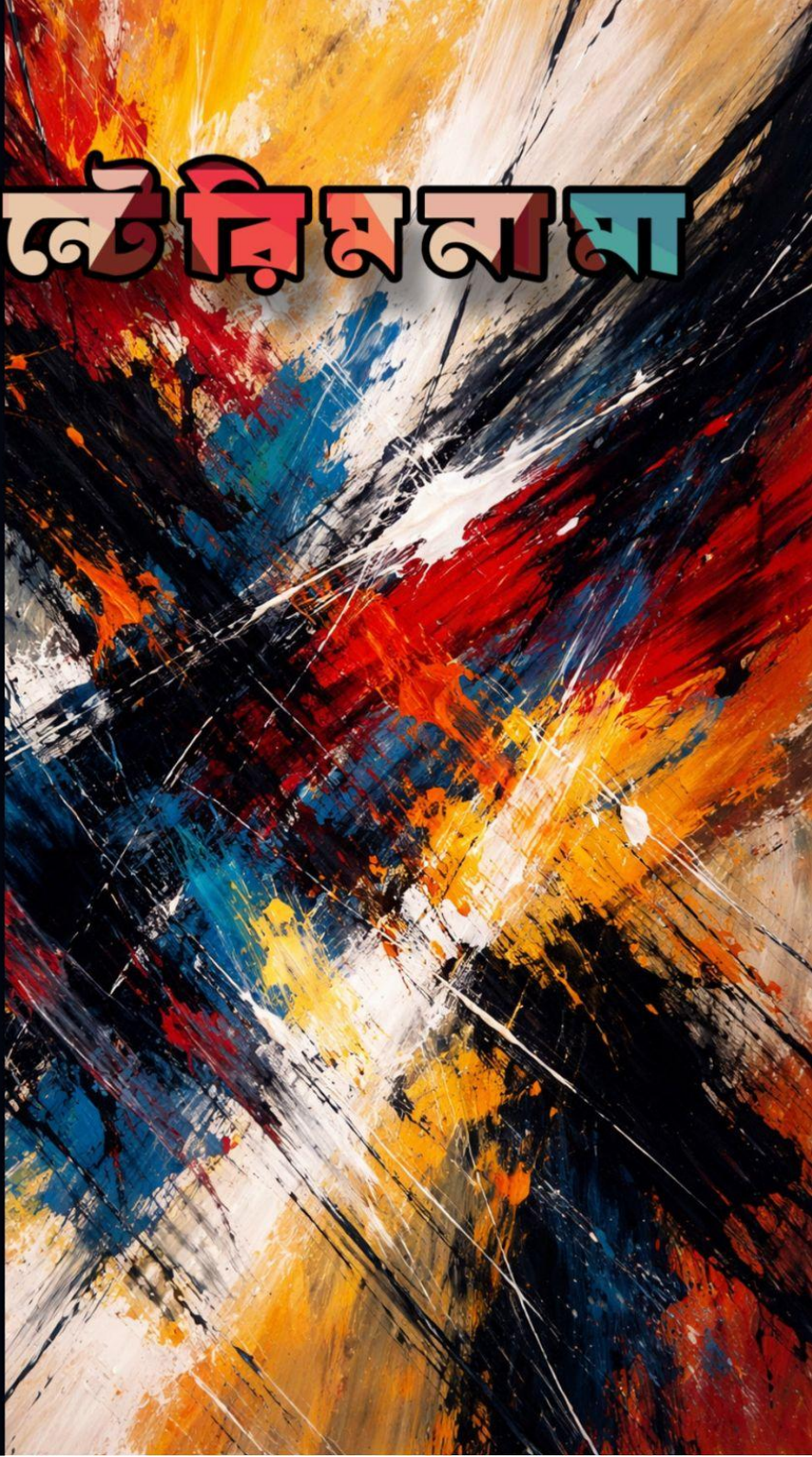

ইন্টেরিমনামা

মো. কিবরিয়া

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সূচিপত্র

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ	০৫
‘ইনক্লুসিভ’ কি হওয়া যাচ্ছে?	১০
জুলাই অভ্যুত্থানোত্তর পর্যবেক্ষণ ও করণীয়	১২
গণতন্ত্র- ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ঐক্যের সূত্র	১৮
ভিত্তিকাঠামোর সংস্কার জরুরি	২০
বাংলাদেশে কি শক ডক্ট্রিন প্রয়োগ করা হচ্ছে?	২৩
সংবিধান ও সংস্কার প্রসঙ্গে	২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কি নিছক প্রতারণা?	২৯
জুলাইকে ধারণ করেই সংকট অতিক্রম করতে হবে	৩২
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি ও সংস্কার প্রসঙ্গ	৩৬
নিওলিবারেল যুগের নয়া ফ্যাসিবাদ	৪২
জুলাই সনদ ও বামপন্থীদের নীতিনিষ্ঠ অবস্থান	৪৬
সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট প্রসঙ্গে	৫২
গণভোট কেন প্রতারণামূলক?	৫৫
ইন্টেরিমকাল শেষে নির্বাচনের প্রতীক্ষা	৫৭

ভূমিকা

আমরা এক টালটামাল ইন্টেরিমকাল অতিক্রম করলাম। ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট মাসে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পার করে আবারো নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের পর যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো, তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। গণঅভ্যুত্থানের পর এই সময়কালে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে, দেশের রাজনীতিতে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

অন্তর্বর্তী সরকারের এই সময়ে রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে নানারকম আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থান ও তার কুশীলব কে, এ নিয়েও নানা ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়কালে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও বেশ আলোচিত-সমালোচিত। ইতিহাস অনেক কিছুরই উত্তর হয়তো আমাদের সামনে হাজির করবে। ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে সে সময়ের কিছু লেখা নিয়ে এই সংকলন।

এই লেখাগুলো ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে লেখা। এর মধ্যে কয়েকটি নিজস্ব পর্যবেক্ষণসৃষ্ট নোট হিসেবে লিখে রাখা, কোনো কোনোটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, আবার কয়েকটি লেখা নিছক সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা। সে কারণেই লেখাগুলোর ভাষারীতি ও শব্দচয়নে পার্থক্য আছে। বইয়ের প্রয়োজনে কিছু ভাষাগত পরিমার্জন করা ছাড়া এই লেখাগুলোতে তেমন পরিবর্তন আনা হয়নি, যাতে সময়ের একটা ছাপ পাওয়া যায়। লেখাগুলো সাজানোও হয়েছে সময়ের ক্রমানুসারে।

আশা করি লেখাগুলো এই অস্থির সময়কে কিছুটা হলেও ধরতে সাহায্য করবে। সেই সাথে জুলাই অভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকার, জুলাই সনদ ইত্যাদি বিষয়কে এসময়ে বামপন্থীদের মূলধারা কীভাবে বিশ্লেষণ করেছে তার একটা ধারণাও পাওয়া যাবে।

মো. কিবরিয়া
২১.০২.২৬

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

১.

কোটা সংস্কারের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই অর্থে অরাজনৈতিক ছিল না। প্রাথমিকভাবে ছাত্রদের কিছু সংগঠনের নেতৃত্ব সমন্বয়ক টিম তৈরি করে, সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে কোটা সংস্কারের এই আন্দোলন অগ্রসর করে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে, সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রচলিত সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে মাঠে নামতে স্বস্তিবোধ করেনি, অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা সে অর্থে ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে সক্রিয় থাকা প্রথাগত ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রতিনিধি ছিলেন না। নেতৃত্বের আপাত অরাজনৈতিক এই চেহারাই হয়তো আন্দোলনকে সব মত পথের শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য করেছিল। এর আড়ালে সংগঠিত বিভিন্ন শক্তির সমর্থন ও সহযোগিতাও ছিলো।

২.

কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে আদালতের রায় আসার পর সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ হয়। মাঝে ঈদের ছুটি থাকায় সম্ভবত কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠকরা গুছিয়ে উঠতে এবং পরিকল্পনা করতে সুযোগ পায়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে শিক্ষকেরাও কর্মবিরতি শুরু করে। ঢাবি আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হলেও, দ্রুতই সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোটা সংস্কারের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, এবং একেকখানে একেকভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব গড়ে ওঠে । প্রচলিত মূলধারার সংগঠন এই আন্দোলনের কেন্দ্রে সরাসরি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। তারা আন্দোলনের মূল নেতৃত্বের (সমন্বয়ক টিম) অনুগামী হয়েছে

বা হতে বাধ্য হয়েছে। তবে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, অংশ নিয়েছে।

৩.

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামকরণটি এই প্লাটফরমটিকে কোটা সংস্কার থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের পর্যায়ে উন্নীত করতে ভূমিকা রেখেছে। আন্দোলনের নেতৃত্বের একটা অংশের মধ্যে চিন্তাগত বা ভাবাদর্শগত কিছু প্রস্তুতি এবং চিন্তার ন্যুনতম ঐক্য থাকলেও, সামগ্রিকভাবে আন্দোলন যত দ্রুত এগিয়েছে সেটি মোকাবিলা করার মত যথেষ্ট সাংগঠনিক বা ভাবাদর্শগত প্রস্তুতি ছিলো কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। মূল নেতৃত্ব তো বটেই, বরং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভাবাদর্শগত বৈচিত্র্য আছে এবং পরিস্থিতিগত কারনে 'ইনক্লুসিভ' হওয়ার বয়ান এখন শোনা পেলেও, এই ইনক্লুসিভিটির সংজ্ঞায়ন একেকজন একেকভাবে করেছেন। তবে আন্দোলনের নানা ঘটনাপ্রবাহে ছাত্রনেতৃত্ব সামনে থাকায় এবং আন্দোলনপরবর্তী সময়ে সরকারে ছাত্রনেতৃত্বের একাংশের প্রতিনিধি থাকায় তাদের চিন্তাচর্চা অনেকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

৪.

'রাজাকার' অভিধাটির (অপ)রাজনৈতিক ব্যবহার, এর মাধ্যমে বিরোধিতাকারী বর্গকে নাকচ করার ফর্মূলা এই আন্দোলনে কাজ করেনি। শিক্ষার্থীরা প্রথমে 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার, রাজাকার' বলার মাধ্যমে রাজাকারিকরণের অপরাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে, এবং কিছুক্ষণ পরেই 'কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার' বলে স্লোগানটাকে আরো অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। শেখ হাসিনার সরকারকে হাজার হাজার ছাত্রের স্বৈরাচার বলার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের জড়তা কাটানোর উপলক্ষ তৈরি হয়েছিলো। স্বৈরাচারের বয়ানের পরাজয় সেখান থেকেই শুরু।

৫.

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের বহুদিনের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে জমা হচ্ছিল। আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগের ব্যবহার সরকার ও ছাত্রলীগের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছিল। শিক্ষার্থীদের নিজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার

ক্ষোভ ও অপমান স্বৈরাচারবিরোধী অবস্থানে পরিণত হতে সময় লাগেনি। স্থানীয় পর্যায়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের দোসর ছোট ছোট গুন্ডা, মাফিয়াদের মূর্ত চেহারা প্রান্তের মানুষের কাছে কেন্দ্রস্থ স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিমূর্ত অথচ শক্তিশালী ইমেজ তৈরী করেছিলো।

৬.

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের পরাজয়ের পর আগে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে শিক্ষার্থীরা যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে নেমে তৎকালীন সরকারের সমস্ত পরিকল্পনাকে নস্যাৎ ও শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিলো।

৭.

সাহসী আবু সাঈদকে হত্যার ভিজ্যুয়াল আন্দোলনকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলো।এরপর পুলিশ, বিজিবির নির্বিচার গুলিবর্ষণ, শিশুমৃত্যু, সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে আসা নৃশংসতার চিত্র, মানুষকে পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে নিয়ে গিয়েছিলো। কার্ফু, ইন্টারনেট শাটডাউন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেনি, বরং ঐক্যবদ্ধ করেছে। আন্দোলনকারীদের কেন্দ্রীয় ব্যানারের সমন্বয়কদের গ্রেপ্তার করা হলেও আন্দোলনকারীদের মনোবল ভাঙেনি, বরং তারা আরো দৃঢ়তার সাথে সরকার পতনের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আন্দোলনের মূল কেন্দ্রের বাইরেও জেলায় জেলায় বা এলাকায় এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো।

৮.

এই আন্দোলন কেন্দ্র থেকে তৃণমূলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ ও সংহতিবোধ তৈরি করেছিলো। বিশ্বাসের পার্থক্য, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য, ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা, শ্রেণিগত পার্থক্য সব কিছু ছাপিয়ে তারা এক উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিল। ক্লাসে ক্লাসে, বিভাগে বিভাগে সমস্ত শিক্ষার্থী একজোট হয়েছিলো, একেকজন একেকভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে অথবা সমর্থন দিয়েছিলো। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যে প্রজন্ম স্কুলের শিক্ষার্থী হিসেবে মাঠে নেমেছিল, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া হিসেবে লড়াই করেছে,

আবার, এ সময়ের স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা সে সময়ের আন্দোলনের আদলে রাষ্ট্র মেরামতের কথা তুলে ধরেছিল।

৯.

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা মাঠে নামার পর আন্দোলন ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে রাজপথে চলে এসেছিলো। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও এই সুযোগে রাজপথে কর্মী মোবিলাইজ করার সুযোগ পায়। বিশেষত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ছাত্রসংগঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন মোবিলাইজ করে। এছাড়াও ঢাকায় রিকশাশ্রমিক, হকার, নিম্নবিত্ত মানুষেরাও এই আন্দোলনে জনতার কাতারে শামিল হয়। শহীদদের তালিকায় তারাও আছেন, অনেকটা অনুচ্চারিত হয়ে।

১০.

সর্বশেষ রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে আওয়ামী হেজিমনির বাইরে একটা অংশ যারা বিচ্ছিন্নভাবে লড়ছিল, তারা এবার প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমেছিলো। এদের অধিকাংশই কোন বড় দলের লেজুড় ছিল নার‍্যাপ গান, অপটু হাতের গ্রাফিতি, দেয়াল লিখন প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকে প্রথম দফা কার্ফু, জেল জুলুম ও রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রের একতরফা প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে সাময়িক নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টাও এদের তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ (বিশেষত শিক্ষক নেটওয়ার্ক) সাহসিকতার সাথে মাঠে নামে, কর্মসূচি পালন করে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা কার্ফু চলাকালীন গানের মিছিল করে, লেখক-বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ ভয় অথবা জড়তা ভেঙে অবস্থান নেয়। আন্দোলন ক্রমশ একদফার দিকে এগুতে থাকলে, ছাত্রজনতার চাপে, সমন্বয়কদের মূল প্লাটফর্ম থেকে ঘোষণা আসার আগেই শহীদ মিনার অভিমুখী দ্রোহযাত্রা থেকে স্বৈরাচার পতনের ডাক দেয়া হয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির এই অংশের সমর্থন ও অংশগ্রহণ চূড়ান্ত ঘটনাপ্রবাহে ভালো ভূমিকা রাখে এবং এই অংশের মধ্যে ফ্যাসিবাদের অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়।

১১.

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শক্তি এই আন্দোলনে নানামাত্রিকভাবে সম্পৃক্ত ছিল। যেকোন আন্দোলনেই নানামুখী শক্তি থাকে। এই শক্তিগুলো একেক উদ্দেশ্য, একেক লক্ষ্য, একেক বুঝ থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। একটা মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী হুবহু ঘটনাপ্রবাহ ঘটেছে, এমনটা মনে হয়নি। বরং আন্দোলনের অভিমুখ, গতিমুখ ও ব্যাপকতা যেসকল শক্তি সময়মতো উপলব্ধিতে আনতে পেরেছিল, তারা তাদের জায়গা থেকে আন্দোলনকে প্রভাবিত করতে পেরেছে এবং স্বৈরাচার পতনের পরের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শক্তি ও প্রভাব অনুযায়ী নিজেদের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করেছে ও করছে।

১২.

আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী, অংশগ্রহণকারী ও আন্দোলনের সুবিধাভোগীদের মধ্যে নানামাত্রিক দ্বন্দ্ব ছিলো এবং এখনো আছে। ফ্যাসিবাদ টিকে ছিলো সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি, লুটেরা মাফিয়া ব্যবসায়ী ও আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থনে। এইসকল ডিপ স্টেটের কাঠামো ভেঙে দেয়ার মত বিপ্লব এবার হয়নি, কারন সেই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ভাবাদর্শিক অবস্থান এই আন্দোলনের কেন্দ্রে আসতে পারেনি । এই কাঠামো টিকিয়ে রেখে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ সহজ নয়।

১৩.

সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ, এলিট গোষ্ঠী, সিভিল-মিলিটারি ব্যুরোক্রেসির সাথে আন্দোলনের স্পিরিটের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য হচ্ছে, আরো হবে। সকলের মতাদর্শগত অবস্থানও উন্মোচিত হতে থাকবে। এই ভাঙা গড়ার খেলায় এনার্কি থাকবে, হতাশা থাকবে, উচ্ছাস থাকবে, অত্যুৎসাহ থাকবে, সম্ভাবনাও থাকবে। এই ভাঙা-গড়ার তীব্রতর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আগামী কয়েক মাসে আমাদের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শক্তি কোন অবস্থানে কতটুকু থিতু হতে পারছে, তাই নির্ধারণ করবে আগামী দিনের বাংলাদেশের চরিত্র।

(২৬.০৮.২০২৪)

‘ইনক্লুসিভ’ কি হওয়া যাচ্ছে?

ইনক্লুসিভ শব্দটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বেশ আলোচিত হচ্ছে, বিশেষত বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত তরুণেরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন পরিষদ বা কমিটি যখন বানাচ্ছেন, তখন তাকে ‘ইনক্লুসিভ’ দেখাতে নিজ মতাদর্শের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন ধর্মপরিচয়, জাতিপরিচয়ের (এমনকি রাজনৈতিক পরিচয়ের) উপস্থিতি নিশ্চিত করছেন, এবং তার মাধ্যমে ‘ইনক্লুসিভ’ চরিত্র দেখানোর একটা ইচ্ছাকৃত তৎপরতা দেখা যাচ্ছে । দাঁড়ি-টুপি-হিজাবের সাথে জিন্স-টিশার্টের সহাবস্থান, বিভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাসের মানুষের পোশাকি সহাবস্থান দেখতে হয়তো ভালোই লাগে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাদের এই ‘ইনক্লুসিভ’ দুনিয়ায় কি নিম্নবর্গের দৈনন্দিন রুটি-রুজির সংগ্রামের স্বরগুলা পৌঁছাচ্ছে ঠিকঠাক? কেন্দ্রস্থ এলিট শিক্ষিত বুঝদার নাগরিকরা কি যথেষ্ট কনফিডেন্ট যে তারা প্রান্তস্থ নাগরিকদের দৈনন্দিন সংগ্রামের ভাষা পড়তে পারছেন?

ধরে বেঁধে মনমতো একজন কৃষক, একজন শ্রমিক, একজন ক্ষেতমজুর, একজন রিকশাশ্রমিক বা একজন হকারকে এনে কমিটিতে ঢুকিয়ে দিলেই তা ‘ইনক্লুসিভ’ হয়ে উঠবে, তা নয়। এলিট বা মধ্যবিত্ত প্রভাবিত ‘কমিটি’তে ঢুকলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই যে তারা প্রান্তিক ও অনুগামী হয়েই যে থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন, সেটাও দেখা যায়। দরদ বা অনুকম্পা দেখিয়ে না, সমমর্যাদা দিয়া প্রান্তস্থ নিম্নবর্গের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার একটা উপায় না বের করতে পারলে ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ কীভাবে করবেন, সে কথা কী ভাবছেন?

নিম্নবর্গের সংস্কৃতিকে মধ্যবিত্তনির্ভর কালচারাল স্পেসে ইন্ট্রোডিউস করতে চান, এই কথা শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু সচেতন ‘নাগরিক সমাজে’ নিম্নবর্গের যে নির্মাণ করা হচ্ছে

ইদানীং, তাতে মনে হচ্ছে ধর্ম বা জাতিপরিচয় ছাড়া তাদের আর কোন সাংস্কৃতিক পরিচয় নাই। অথচ এই নিম্নবর্গের প্রতিদিনকার জীবন জীবিকার লড়াই অঞ্চল এবং কর্মপরিচয়ভেদে বৈচিত্র্যময় জীবনভাষ্য নির্মাণ করতেসে প্রতিনয়ত, তাকে পড়তে না পারলে সেই সংস্কৃতিকে ধরতে পারবেন কীভাবে?

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচারকে শুধু ৭২-এর চার মূলনীতির কাউন্টার হিসাবে না দেখে যদি সত্যি সত্যিই সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রয়োগ করতে চান, তাইলে প্রকৃত কালচারাল ওয়ারটা কোথায় হচ্ছে, তা খুঁজে বের করা জরুরি। জাতি-ধর্মবাদী কালচারাল ওয়ারের আড়ালে নিম্নবর্গের দৈনন্দিন জীবনযাপনের আওয়াজকে আড়াল করার মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদের বীজ বপণ করা হয়, এই কথাও মনে রাখা দরকার। আমাদের পরিষদ গঠনকারী শহুরে 'কেন্দ্রীয়' বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দ তা আমলে নেবেন কি?

(০৯.০৯.২০২৪)

জুলাই অভ্যুত্থানোত্তর পর্যবেক্ষণ ও করণীয়

১. দেশ আসলে চালাচ্ছে কারা?

ক. ছাত্ররা?

ছাত্ররা নিজেদের পাওয়ারফুল ভাবছে, এতে সন্দেহ নাই। তাদের প্রতিনিধি সরকারে আছে। ক্রমাগত ছাত্রদের পিঠ চাপড়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা এটা ওটা দাবি করছে, সমাজে বুক ফুলায় চলছে। তাদের একটা অংশ নানা থিওরিটিকাল আলাপ করছে, রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলছে। এই সরকার যেহেতু প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত না, সুতরাং মাঠে সরকারের কর্মীবাহিনী হয়ে সেই ভ্যাকুয়াম পূরণ করে দিচ্ছে নানা রং-এর ছাত্ররা। আপাতত প্রয়োজন হইলে লাঠিয়াল বাহিনীর কাজটাও তারা করতে পারে তার প্রমাণ আনসার পেটানোতেই দেখা গেছে। কিন্তু দিনশেষে তারা কতটুকু প্রভাব রাখবে আর কতটুকু শোপিস হয়ে থাকবে সেটা অদূর ভবিষ্যতই বলে দেবে।

খ. বিএনপি?

বিএনপি মাঠে অনেক কিছু দখল করে নিয়েছে। চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে বিএনপিরই আধিপত্য। বিএনপি ছাড়া সব সেক্টরে লোক বসানোর মত আর কোন পার্টি দেখা যাচ্ছে না। জামাতসহ অন্যান্যরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ কিছু কিছু পদ দখল করার চেষ্টা করছে বটে, এবং লোক অনুপাতে তারাও কম নয়। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া বিএনপির মত সব সেক্টরে দেয়ার মত সেই লোকবল জামাত বা অন্যান্যদের নেই, আর থাকলেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। কিন্তু এত কিছুর পরও স্বস্তিতে নাই বিএনপি। সরকারে তাদের কিছু লোকজন থাকলেও, তারা সম্পূর্ণ কনফিডেন্ট না। সরকারের ভূমিকা শেষমেশ কি হবে এই নিয়ে তারা সংশয়ে আছে।

গ. আর্মি?

আর্মি স্বস্তিতে আছে বলে মনে হয়না। আর্মির মধ্যে বিভাজন আছে। ওয়াকার সাহেবের নিয়ন্ত্রণে সব আছে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া দেশি বিদেশি চাপের মুখে আর্মি এসময় রাষ্ট্রযন্ত্রের দখল নিয়ে মূল শক্তি হয়ে যাবে, এটার লক্ষণ খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

ঘ. জামাতসহ পলিটিকাল ইসলামিস্টরা?

এইটা সন্দেহ নাই জামাতসহ ইসলামিস্টদের বিভিন্ন অংশ (যাদের মধ্য অতিউগ্ররাও আছে) সারফেসে চলে আসছে। গণঅভ্যুত্থানে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এতদিন যারা আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল তারা সামনে আসছে। ইসলামিস্ট পরিচয় নিয় রাজনীতির মাঠ দাপানোর চেষ্টা করছে। ইসলামিস্টদের বিভিন্ন উগ্রবাদী দল ভাষ্কর্য মাজারসহ বিভিন্ন কিছু ভাঙছে, হামলা করছে, উগ্রবাদী মত ছড়াচ্ছে । আগে যা গোপনে করত, এখন তা প্রকাশ্যে করছে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার মূল খেলায় তারা কিছুটা স্টেক নেয়ার চেষ্টা করলেও খুব বেশিদূর এগুতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

ঙ. আমজনতা?

যেকোন আন্দোলন জনগণের গণচেতনাকে অগ্রসর করে, অল্প সময়ের জন্য হলেও নিজের শক্তিতে আস্থা যোগায়। কিন্তু গণআন্দোলনের পর যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসছে, তারা আমজনতার নির্বাচিত প্রতিনিধি না। সুতরাং আমজনতার স্টেক সরকারে সেই অর্থে নেই, সে অর্থে আমজনতা সরকার চালাচ্ছে না। সরকারের প্রতি তাদের আস্থা ততটুকুই, যতটুকু বিগত রেজিম এবং প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলার প্রতি অনাস্থা।

চ. ডিপস্টেট?

সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি, ক্যাপিটালিস্ট ক্লাসের নেতৃত্বাধীন ডিপস্টেটকে ভাঙা যায় নাই। তবে তাদেরও নানাক্ষেত্রে আপোস করতে হচ্ছে, নিজেদের ক্ষমতার কেন্দ্রে আরো শক্তভাবে বসাতে নানামুখী সংস্কারের আলাপ দিতে হচ্ছে। এরা সরকারের উপর যথেষ্ট প্রভাব রাখছে।

ছ. মার্কিন সমর্থনপুষ্ট এলিট এনজিওনির্ভর সুশীল সমাজ?

ইউনুস সাহেবের নেতৃত্বে এরাই মূলত এই সরকারের মূল পলিসি মেকার। এখনো পুরা নিয়ন্ত্রণ তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে তারা আপোসরফা করছে। তাদের মূল টার্গেট এইখানে মার্কিন প্রভাবাধীন একটা পশ্চিমা ধাঁচের লিবারেল ডেমোক্রেসির নামে ইন্টারন্যাশনাল নিও-লিবারেল নীতি ও ফিনান্স ক্যাপিটালের স্বার্থ রক্ষা করা। সেই জন্যে সংস্কার-টংস্কারের আলাপ দেয়া জরুরি তাদের জন্যও। এই অংশটাই হয়ত দিনশেষে ক্ষমতা সংহত করবে অন্যান্যদের সাথে নানামুখী আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্য দিয়ে। ভারতসহ বিভিন্ন পরাশক্তিও এইখানে এদের সাথেই নেগোশিয়েট করতে চাইবে বলে মনে হয়।

তবে সামনের দিনে এই শক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব আরো প্রকাশ্য হবে বলেই মনে হচ্ছে।

২. দেশে কি আসলেই পরিবর্তন এসেছে?

অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে। একটা স্বৈরাচারী রেজিমের পতন ঘটে গেছে জনগণের সম্মিলিত শক্তিতে। জনগণের গণআন্দোলন ছাড়া এর চেয়ে ভালো কোন পদ্ধতিতে বিগত সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হতো বলে মনে হয়না। তবে আন্দোলনে বামপন্থীরা আরো ফোরফ্রন্টে থাকলে, মাঠে আরো বেশি দৃশ্যমান থাকলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ডানপন্থীরা এত সহজে এগিয়ে যেতে পারত না।

৩৬ জুলাই বা ৫ আগস্ট বিপ্লব হয় নাই, দ্বিতীয় স্বাধীনতাও আসে নাই। দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে ৭১-এর কাউন্টার হিসাবে ২৪-রে নিয়ে আসা খুবই স্থূল প্রচেষ্টা। মনে হয় না এই প্রজেক্ট সফল হবে।

এই গণঅভুত্থানের পর দেশের শিক্ষিত মিডলক্লাসের একটা বড় অংশ রাষ্ট্র ও রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে, নানা আলাপ ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাচ্ছে। ভুল সঠিক যাই হোক, আলাপ করার উৎসাহ ও প্রবণতা কিছু নির্দিষ্ট পেরিফেরিতে বেশ বেড়েছে। আবার অনিশ্চয়তার কারণে চাপা ভয় বা আতঙ্কও আছে।

বিপ্লব যেহেতু হয় নাই, রাষ্ট্রক্ষমতায় যে শ্রেণি ছিল সেই শ্রেণিই আছে। দেশি বিদেশি শাসকশ্রেণি নিজ স্বার্থেই এমন কিছু সংস্কার করতে চাইবে যাতে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা যায়। হাসিনা পতনের পর কিছু লিবারেল এজেন্ডা সামনে এনে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

করার কাজ এগুতে পারে। সেই সংস্কারগুলা যদি একটা মিনিমাম ডেমোক্রেটিক স্পেস তৈরি করতে পারে, সেটাকেও অগ্রগতি হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। সেইটুকু অর্জনের জন্য বাম-লিবারেল অংশগুলার সক্রিয় ভূমিকা রাখার স্পেস করে নিতে হবে।

৩. দেশ কি ইসলামিস্টদের হাতে চলে গেছে?

রাষ্ট্রক্ষমতায় স্টেক যতটুকু থাকুক না থাকুক, মিডলক্লাসের শহুরে কালচারাল-ইন্টেলেকচুয়াল স্পেসে ইসলামিজমের প্রভাব ভালোই বেড়েছে। এই কাজটা পলিটিকাল ইসলামিস্টরা করেনি। আধুনিকতার সমালোচনা করতে গিয়ে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ মোকাবিলার নামে, নিজ পরিচয় খুঁজতে গিয়ে, মডার্নিটির নতুন ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টায়, পশ্চিমকেন্দ্রিক বয়ানের বিরোধিতায় তথাকথিত প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিকোণ খুঁজতে গিয়ে, জাতিবাদী বয়ানগুলোকে নাকচ করে নতুন ভাষা নির্মাণ করার নামে ইসলামপন্থাকে বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে প্রাসঙ্গিক করে তুলসেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই। ইনক্লুসিভনেসের আলাপটা মূলত তারা তুলেছেন মিডলক্লাসের কালচারাল-ইন্টেলেকচুয়াল স্পেসে ইসলামপন্থা বিষয়ক আলাপের জায়গা করার জন্যেই।

নিম্নবর্গের কালচারাল স্পেসে নানাভাবেই ইসলাম নানা বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির ছিলোই, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কালচারাল রেমিট্যান্সের প্রভাবে সালাফিস্টদের প্রভাবও নানাভাবে সমাজে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে সমাজে ইসলামাইজেশন আওয়ামী আমলেই বেড়েছে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পর শহুরে 'আধুনিক' মধ্যবিত্তের কালচারাল স্পেসে ইসলামপন্থী ভাষা ও বয়ানগুলো জোরেশোরে সামনে আসায় এ নিয়া নানা অংশের অস্বস্তি বেড়েছে। বিশেষত প্রগতিশীল বলে পরিচিত এবং কোন কোন 'বামপন্থী' মহলে এই অস্বস্তিটাই বাংলাদেশের মূল সমস্যা কিংবা বাংলাদেশের অস্তিত্ব সংকট হিসাবে হাজির হচ্ছে। অথচ এরা কেউই এইসব বয়ানগুলাকে সরাসরি মোকাবিলা করছেন না, সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রিটিকগুলাকে আমলে নিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সংকটকে তুলে ধরছেন না, কিংবা এইসব আলাপের বাইরে গণমুখী অন্যান্য এজেন্ডাকে মুখ্য করে তুলতে পারছেন না। গণঅভুত্থানের পূর্বে ও পরে 'বাম-প্রগতিশীল' শক্তির বয়ান শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আর সেকারনেই হয়তো অনেকের মনে হচ্ছে যে, দেশটা ইসলামিস্টদের কবজায় চইলা গেছে।

৪. 'বাম'-প্রগতিশীলদের সংকট কোথায়?

আমাদের ট্রাডিশনাল 'বাম-প্রগতিশীল' দল বা শক্তিগুলা দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের শক্তি বিবেচনায়, কিংবা ক্ষমতার খেলায় একেবারেই দুর্বল ছিল বা আছে। তবু সফট পাওয়ার তৈরির এক্টর হিসাবে তারা অন্তত মধ্যবিত্ত সমাজের কালচারাল-ইন্টেলেকচুয়াল স্পেসে প্রভাব রাখতে সক্ষম ছিলো। এমনকি জুলাই গণঅভ্যুত্থানেও বামপন্থী-প্রগতিশীলদের একাংশ প্রকাশ্য অবস্থান নেয়ায় আন্দোলনটারে সার্বজনীন চেহারা দেয়া গেছে। কিন্তু এই অংশটার কেউ কেউ এখন সেই স্পেসে নিজের অবস্থান নিয়ে শঙ্কিত, আবার কেউ কেউ ইসলামপন্থী রাজনীতির সাথে বামপন্থার সংশ্লেষণের মাধ্যমে তথাকথিত 'বাইনারি' ঘুচানোর চেষ্টায় লিপ্ত।

মুশকিল হচ্ছে ট্রাডিশনাল বাম-প্রগতিশীলরাই হোক আর তথাকথিত বাইনারি ঘুচানোর চেষ্টাকারী 'ইসলামপন্থী' বাম হোক, পাওয়ার কোশ্চেন নিয়ে, কিংবা মাঠ দখলের লড়াই নিয়ে তাদের অধিকাংশই ভাবছেন না, বা ভাবার সামর্থ্যও নাই। কালচারাল-ইন্টেলেকচুয়াল স্পেসেও বামপন্থী এজেন্ডাগুলা সামনে আসছে না। মেজরিটির ধর্মপরিচয়ের আলাপ করতে গিয়ে মেজরিটির কর্মপরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। কর্মপরিচয়ের রাজনীতিকে বা শুধু শ্রেণি রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জনগণের ধর্মপরিচয় বা সংস্কৃতি-চিন্তাকে মিনিমাম ধর্তব্যে না আনা যদি ভুল হয়, তাইলে সেইটা কারেক্ট করতে গিয়ে কর্মপরিচয়ের রাজনীতিকে সাইডলাইন করে দেয়া আরো বড় ভুল, এই বোধটা থাকা দরকার।

৫. করণীয় কি?

ক. যে প্রশ্নগুলা এখন সামনে আসছে (সংবিধান, মূলনীতি, ইসলাম, সংস্কার, রাষ্ট্রগঠন, জাতীয়তাবাদ, ইলেকশন ইত্যাদি) সেগুলোকে এভয়েড করে না, বরং সেই প্রশ্নগুলারে মোকাবিলা করে অন্য আলাপগুলো, বিশেষত বামপন্থীদের এজেন্ডাগুলো সামনে আনা দরকার। এখনকার চলতি আলাপে বামদের সুস্পষ্ট অবস্থান না থাকলে কাছাকাছি ভাবনার মানুষগুলাও বিভ্রান্ত অথবা অন্য কোন ভাবনার অনুগামী হতে থাকবে। আবার যেই আলাপগুলা এখন সামনে আছে তার বাইরেও বামদেও নিজস্ব এজেন্ডাগুলা সামনে আনতে হবে।

খ. যেহেতু আপাতত বিপ্লব হচ্ছে না, তাই খেলায় পার্টিসিপেট না করে পরের খেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, এইরকম ভাবনা ভাবা ভুল হবে। গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার স্টেক বামদেরও নিতে হবে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে লিবারেল ডেমোক্রেটিক যতটুকু স্পেস ক্রিয়েট করা যায়, তার জন্য সক্রিয়ভাবে মাঠে থাকতে হবে। রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন প্লাটফর্ম, নাগরিক কমিটি, বিভিন্ন পরিসরে আমাদের মিথস্ক্রিয়া করতে হবে ও নিজস্ব বয়ান উপস্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন অংশের মানুষের সাথে ইন্টার‍্যাকশনে যেতে হবে।

গ. সরকারের বা সরকারে যেসব স্টেকহোল্ডাররা আছে, এমনকী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র প্লাটফর্মেরও নির্মম সমালোচনা করতে হবে, প্রশ্নহীন লেজুড়বৃত্তি করা যাবে না। এই ব্যাপারে দ্বিধা রাখলে মুশকিল হবে। তবে আমাদের বয়ান আর পরাজিত ফ্যাসিস্টদের বয়ানের ফারাক থাকতে হবে, তাদের তৈরি করা ফাঁদগুলা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

ঘ. মাঠের লড়াইয়ে যারা আছেন, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার আন্দোলনকে নির্জীব করা চলবে না, বরং নিজ নিজ সামর্থের জায়গাগুলায় আন্দোলন জারি রাখতে হবে। ভোটাধিকার-গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক আওয়াজও জারি রাখা দরকার।

ঙ. সর্বোপরি একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রকল্প নির্মাণ করে, তাকে সামনে রেখে এগুতে হবে। শুধু প্রেশার গ্রুপ হিসাবে না, রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেদের শক্তিকে মূর্ত করে তুলতে হবে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি, সংগঠনগুলার সাথে লিবারেল বিভিন্ন প্লাটফর্মের বোঝাপড়া বাড়িয়ে একটা আমব্রেলা গড়ার কথা ভাবা যেতে পারে। প্রথাগত রাজনৈতিক জোট না হলেও, কমন কিছু পয়েন্টে বিভিন্ন তৎপরতার কালেক্টিভ তৈরি করে আগানোর কথা ভাবা যেতে পারে, যার অভিমুখ হবে রাজনৈতিকভাবে নিজেদের প্রাসঙ্গিক ও মূর্ত করে তুলে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া।

(২১.০৯.২০২৪)

গণতন্ত্র- ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ঐক্যের সূত্র

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো এক দফায়। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের পদত্যাগের দাবিতে।

এখন সেই ঐক্য রক্ষা করতে হলে ন্যুনতম কিছু বিষয়ে জনগণ ও রাজনৈতিক পক্ষগুলোর ঐক্যমত প্রয়োজন। শুনতে ম্যাড়মেড়ে অবিপ্লবী লাগলেও, 'গণতন্ত্র-ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা'ই এই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার শর্ত। সেই গণতন্ত্র-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায়, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে সংস্কারগুলো প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করাই বর্তমান সরকারের মূল দায়িত্ব।

এর বাইরেও দেশের নানা রাজনৈতিক পক্ষের নানা রকম ভাবনা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহে যেসব ব্যক্তি, সংগঠন ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে এসেছে তাদেরও সুনির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক প্রস্তাবনা বা ভাবনা আছে। তারাও রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিকে তাদের নিজেদের ভাবনা বা প্রস্তাব বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলেই চলে না, তাকে সুনির্দিষ্ট করতে হয়, সেই রাজনৈতিক প্রস্তাবনাকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে জনসম্মতি আদায় করে নিতে হয়। শুধু ভাঙা বা বাতিলের দাবি করলেই চলে না, তার পরিবর্তে নতুন যা গড়া হবে, সে প্রস্তাবনাগুলোকেও সুনির্দিষ্ট ও মূর্ত করে তুলতে হয়।

যেকোন প্রস্তাবনাকে জনসম্মতির তোয়াক্কা না করে, রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হলে স্বৈরাচার-ফ্যাসিবাদবিরোধী জনতার ঐক্য ধরে রাখা যাবে না। রাজনৈতিক পক্ষগুলোর ঐক্যমত ছাড়া হঠকারী যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার মত বিপ্লবী পরিস্থিতি বা সে উদ্দেশ্যে জনগণের বৃহত্তর অংশের ঐক্য এখন আছে বলে মনে হয় না।

এই মুহূর্তে ন্যূনতম ইস্যুতে জনগণের বৃহত্তর ঐক্যকে রক্ষা করা না গেলে সংকট আরো ঘনীভুত হবে, রাষ্ট্রে ও সমাজে অস্থিরতা বাড়বে। মানুষ এখন আপাত স্থিতিশীলতা চায়, তার দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা চায়। সেটা না নিশ্চিত করতে পারলে আমূল পরিবর্তন তো দূর কি বাত, একটা যেনতেন নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরেরও অবস্থা থাকবে না। রাজনৈতিক শুন্যতা জনবিচ্ছিন্ন এলিটদের দিয়ে পূর্ণ হয় না।

রোমান্টিক আবেগ নয়, এখন সকল রাজনৈতিক পক্ষের দূরদর্শী, বাস্তবানুগ, সহনশীল, ধৈর্য্যশীল ভূমিকা প্রয়োজন। এই টালটামাল সময়ে একটা অন্তত চলনসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়াই পারে সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পক্ষকে জয়ী করতে এবং তার মাধ্যমে জনগণের ঐক্যকে ধরে রাখতে। আশা করি, ক্ষমতার কেন্দ্রে যেসব পক্ষগুলো এখন পাওয়ার গেম খেলছে, তারা সেই বাস্তবতা বোঝেন।

(২৪.১০.২৪)

ভিত্তিকাঠামোর সংস্কার জরুরি

১.

বিগত বছর ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের পতন হয়েছে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সবাই মানবেন, কোন সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে এই গণঅভ্যুত্থান হয় নাই। জনগণ শেখ হাসিনার পতন চেয়েছে, পতন পরবর্তী রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তন বা সংস্কারে বিভিন্ন রাজনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীর কোন ইশতেহারে জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে, এমন প্রমাণ নাই। গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা ও আদর্শিক পার্থক্য যতদিন যাচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে। জনগণের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কোন পথে সেই পরিবর্তন আনা সম্ভব সে বিষয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা বা বৃহত্তর ঐক্যমত নাই।

২.

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন বা রাষ্ট্রক্ষমতার আশেপাশের অনেকেই এখন নিজেদের নিরংকুশ ক্ষমতাবান ভাবছে। তাদের এই ক্ষমতার বাহাদুরি সাময়িক। রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলো জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে নিজ নিজ এজেন্ডা ও দর্শনের মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে পারছে না, উলটো কেউ কেউ সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠীস্বার্থে যেনতেনভাবে ক্ষমতার খেলায় জিততে চাইছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষার নামে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে গণমানুষের প্রকৃত অভিপ্রায়কে গৌণ করে ফেলা হচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে উগ্র ও সংকীর্ণ ফার রাইট পপুলিজম স্বাভাবিকভাবেই সুবিধা পাচ্ছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রকে নতুন করে গঠনের আলাপ সামনে আনা হয়েছে।

৩.

জনগণের 'সার্বভৌম ক্ষমতা' প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে 'গঠন' করতে হলে জনগণকে সক্রিয় কর্তাসত্তায় পরিণত হতে হবে এ তো সবাই বোঝে। যারা জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলছেন তারা জনগণকে সক্রিয় কর্তাসত্তায় পরিণত হবার উপযোগী অবজেক্টিভ বাস্তবতা তৈরির কথা বেমালুম ভুলে যান। একটা বৈষম্যপূর্ণ সমাজে, যেখানে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওভারহেল্মিং মেজরিটি নিদারুণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে জীবন জীবিকার জন্য নিজের জীবনকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে, সেখানে তাকে রাষ্ট্র নিয়ে ভাববার মত সক্রিয় কর্তাসত্তায় পরিণত করতে হলে তার মধ্যে তো জীবনকে খুঁজে পাবার মত আশাবাদ সৃষ্টি করতে হবে! আর সেই আশাবাদ স্বপ্ন দেখাতে হলে তাকে প্রথমে তো বাঁচার মত বাঁচতে দিতে হবে!

৪.

বেঁচে থাকার মত জাতীয় ন্যুনতম মজুরি, সারা বছরের কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় রেশনিং ব্যবস্থা চালুর মত সাধারণ দাবিগুলো বাস্তবায়িত না করা গেলে জনগণ সক্রিয় স্বাধীন কর্তাসত্তায় পরিণত হওয়ার বদলে ক্ষমতাবান শ্রেণির অনুগামীই হয়ে থাকবে, এটা না বোঝার তো কিছু নাই। এইটুকু কাজ করার জন্য সমাজতন্ত্র কায়েমের দরকার হয় না, লিবারেল ওয়েলফেয়ার স্টেটেই এইগুলো সম্ভব। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা নিম্নবর্গকে কর্তাসত্তা বানাতে চান, স্বাধীন বানাতে চান, তার আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক আওয়াজ বা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবার ভান করেন, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা তাদের নিষ্ঠুর কঠোর জীবনসংগ্রাম নিয়ে ভাবতে অনীহা দেখান। তাদের আলাপে সংবিধান, রাষ্ট্রের নানা সংস্কারের কথা আসলেও অর্থনীতির ন্যুনতম সংস্কারের বয়ান থাকে অনুপস্থিত।

৫.

বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আগে উপরিতলে কিছু সংস্কার হবে কিনা তা অনিশ্চিত, তবে এটা নিশ্চিত যে, এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বড় কোন সংস্কার সম্ভব নয়। এমনকি সংবিধান বদলে ফেললে, আইন কানুন বদলে ফেললেও রাষ্ট্রের প্রকৃত সংস্কার হবে না। রাষ্ট্রের আধিপত্যকারী শ্রেণির শোষণকে উপড়ে ফেলার মত বিপ্লব হয়ে গেছে, বা হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে, এই দাবি কেউ করছে না। তবে ক্ষমতাসীন শ্রেণির সেই শোষণকে অন্তত একটা সহনীয় চেহারায় আনার মত গণমুখী অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রের মত একটা

দমনমূলক যন্ত্রের সংস্কার কীভাবে সম্ভব? অথচ বুদ্ধিজীবীমহলে, মূলধারার গণমাধ্যমে এই আলাপ একেবারেই নেই। চিন্তাশীল তরুণদের মধ্যেও এই পারস্পেক্টিভ থেকে ভাবার লোক একেবারে হাতেগোণা।

৬.

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বামপন্থী অথবা চিন্তাশীল উদারপন্থী তরুণেরা কি করতে পারে? এটা তো সবাই বোঝে যে, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্কের ভোল পালটে দেয়া বিপ্লব এই দেশে ঘটে নাই, খুব দ্রুতই যে ঘটবে এমন আলামতও সীমিত। তবে এদেশে মূলধারার বামপন্থী রাজনৈতিক আরো শক্তিশালী অবস্থান ও বয়ান তৈরি করতে পারলে এই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোর কিছুটা গণমুখী গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য হ্রাসের কর্মসূচি জনপ্রিয় করা ও কিছুমাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিলো। সেটার সুযোগ এখনও শেষ হয় নাই। অর্থনৈতিক সংস্কারের ইস্যু সামনে নিয়ে রাজনীতি করা জরুরি হলেও, এই ইস্যু বিভিন্ন গালভরা কথা ও উপরিতলের কিছু সংস্কারের বয়ানের আড়ালে লুকিয়ে থাকছে। অতীতচারী না হয়ে আজকের দিনের বামপন্থী ও চিন্তাশীল তরুণদেরই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আলাপ এখন জোরেশোরে করা দরকার, এবং এই আলাপে মেহনতি জনগণ ও মধ্যবিত্তের সমর্থন আদায় করা জরুরি।

৭.

এই বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ফার রাইট পপুলিজম ঠেকাতে হলেও, জনগণকে সশস্ত্র করতে হবে বাস্তব জীবনমুখী দাবির অস্ত্রে। রাষ্ট্র ও সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কার করতে হলে গণমুখী ন্যুনতম অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবিগুলো বাস্তবায়ন করার বিকল্প নেই। অন্যান্য আলাপের পাশাপাশি এই আলাপগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসা উচিত।

(০২.০১.২৫)

বাংলাদেশে কি শক ডক্ট্রিন প্রয়োগ করা হচ্ছে?

নাওমি ক্লেইন ২০০৭ সালে লিখেছিলেন ' শক ডক্ট্রিন: দ্য রাইজ অফ ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম' বইটা। এই বইটা নিয়ে ২০০৯-এর দিকে ডকুমেন্টারিও হয়েছিল।

নাওমি ক্লেইন বলেছিলেন, বিভিন্ন ডিজাস্টার ও ক্যাওস তৈরি করে দেশে দেশে কিভাবে অজনপ্রিয় নিওলিবারেল নীতিগুলা চাপিয়ে দেয়া হয়। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা, কখনো অর্থনৈতিক মন্দা, কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর রাষ্ট্র যখন ঠিকমত ফাংশন করে না, মানুষ নানা সংকটে দিশাহারা হয়ে পড়ে তখন শাসকশ্রেণি কীভাবে এইসব চাপিয়ে দেয়। তিনি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, এমনকি ইউএসএ-তেও এই শক ডক্ট্রিন প্রয়োগের উদাহরণ দেখিয়েছিলেন।

আমাদের দেশেও এখন শক ডক্ট্রিন প্রয়োগ করা হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। নৈরাজ্য, ক্যাওস, উগ্রবাদের জুজু এমনভাবে জনমনস্তত্বে শেকড় গাড়ছে, যে এই মূহূর্তে লোকদেখানো মিনিমাম স্টাবিলিটির বিনিময়ে যেকোনো অগণতান্ত্রিক, গণবিরোধী নীতি চাপিয়ে দেয়া সম্ভব। ভূরাজনৈতিক কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাববলয় বিস্তার কিংবা ক্ষমতার বিভিন্ন সমীকরণের কারণে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত করতে অনেকেই চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। সেটা যদি তারা করতে ব্যর্থ হয়ও তাহলেও এই সুযোগে তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দরকষাকষি করে নিজেদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে চাইবে। এদেশীয় সিভিল-মিলিটারি ব্যুরোক্রেসির সাথে কর্পোরেট শক্তির অক্ষ দেশে বিদেশে বহুজনের সাথে নেগোশিয়েট করতে পারে আর তাদের স্বার্থে চাপিয়ে দিতে পারে গণবিরোধী নীতি! যেমন ধরেন, শ্রমিকপক্ষের আপত্তিস্বত্ত্বেও চূড়ান্ত হয়েছে শ্রম আইন সংশোধনের খসড়া।

জনবান্ধব রাজনৈতিক দল, সচেতন মহলের তাই এখন আরো বেশি সক্রিয় ও সচেতন থাকতে হবে। রাষ্ট্রের দূর্বলতা কিংবা ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে তৈরি হওয়া ক্যাওসের মধ্যে গণবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী গোষ্ঠী যাতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি না করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আরো বেশি করে।

(০৭.০৩.২৫)

সংবিধান ও সংস্কার প্রসঙ্গে

অনেকেই বলেন, ৭০ এর নির্বাচনের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল তা ছিল ইয়াহিয়ার লিগাল ফ্রেম অর্ডারের অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য। সেকারণেই ৭১ পরবর্তী সময়ে সেই গণপরিষদকে দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সমালোচনা অনেকে করেন। কেউ কেউ বলেন, ভাসানী ৭০ এর নির্বাচনে না যাওয়ার কারনে, দেশবাসী পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের ছয় দফাকে সমর্থন করার কারনে আওয়ামী লীগ সেই নিরংকুশ ম্যান্ডেট পেয়েছিল। কিন্তু যে গণপরিষদ নির্বাচন হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে , যে গণপরিষদে বিজয়ী দল ভিন্ন ইশতেহার নিয়ে বিজয়ী হয়েছিল তারা কি সেই সংবিধান রচনার 'নৈতিক' অধিকার রাখে? অনেকেই এই প্রশ্ন করেন।

তবে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যদি আমাদের রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি হয়, বা প্রথম লিখিত দলিল হয়, তবে সেই ভিত্তিতেই ৭২-এর সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদ বৈধ। কেননা ঘোষণাপত্রেই বলা আছে ,'আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম'

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিই এই ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রকে যারা মানেন, তাদেরকে তাই এই গণপরিষদকেও আইনত বৈধ মানতে হবে। আর সেই গণপরিষদ বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা যে আইনগত ভিত্তির

উপর দাঁড়িয়ে, সেটাকেই অস্বীকার করা হয়। তাই ঘোষণাপত্রের 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার'কে মূলনীতি হিসেবে কেউ যদি বৈধ মানেন, ৭২-এর সংবিধানকেও বৈধ মানতে হবে, কেননা ঘোষণাপত্র ও সংবিধান উভয়কেই বৈধতা দিয়েছিল 'জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে গঠিত গণপরিষদ'!

৭২ এর সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র ঠিকভাবে চর্চিত হয়েছিল কিনা, এতে শুধু একদলের বা এক ব্যক্তির মতামত প্রতিফলিত হয়েছিল কিনা, কিংবা স্বাধীন রাষ্ট্রে নতুন গণপরিষদ নির্বাচন করে তার মাধ্যমে সংবিধান রচনা করলে তা অধিকতর নৈতিক বা সঠিক হত কিনা, এই প্রশ্ন করা অপরাধ নয়। কিন্তু এসব প্রশ্ন থাকলেও গণপরিষদ বা তার দ্বারা রচিত সংবিধানকে আইনত অবৈধ বলা যায় না, বললে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। অনেকে নৈতিক প্রশ্নের জায়গা থেকে ৭২ এর সংবিধানকে ক্রিটিক করলেও এই সুযোগে অনেকে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়েও ৭২-এর সংবিধানকে অবৈধ বলে প্রচার করে তাকে ছুঁড়ে ফেলতে চায়। যারা সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরো গণতান্ত্রিক কেন হলো না, সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রিটিক করেন, আবার যারা ৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলতে চায় তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যকে বোঝা জরুরি।

২.

বিদ্যমান সংবিধানের অনেক ধারা পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক, এবং এই সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিরংকুশ নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করেন। এছাড়াও আরো বেশ কিছু অসংগতি আছে। সংবিধানকে আরো গণতান্ত্রিক করতে নতুন কিছু সন্নিবেশিতও হতে পারে। দুর্ভাগ্য হলো আমাদের দেশে এইসব অসংগতি বা দুর্বলতা দূর করার চাইতে ঘোষণাপত্র, মূলনীতি ইত্যাদি আদর্শিক ভিত্তি পরিবর্তনের আওয়াজ তোলার মাধ্যমে আসলে মূল শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলোকে আড়াল করা হয়। এই দেশে রেজিম চেঞ্জের সাথে সাথে সংবিধানকেও বারবার কাটাছেঁড়া করা হয়েছে, পপুলিজম চর্চায় মূলনীতি বদলেছে অধ্যাদেশের মাধ্যমে, যুক্ত হয়েছে এমন কিছু বাক্য বা ধারা, যার সাথে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারসাপারের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই। এইসব পরিবর্তন শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলোকে আড়াল করে তথাকথিত 'কালচারাল ওয়ার'-এর ক্ষেত্র তৈরি করে। এসব ইস্যু যেহেতু আদর্শিক এবং যেহেতু তাতে ঐক্যমত্যের সুযোগ নেই, সেহেতু রাজনৈতিক দল তাদের আদর্শ অনুযায়ী জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করতে পারে, আবার যারা পরিবর্তনের পক্ষে নন,

তারাও জনগণকে সাথে নিয়ে তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর। শাসনতান্ত্রিক কোন বিধিবিধানের পরিবর্তন বা সমসাময়িকীকরণ রাষ্ট্রকে আরো গণতান্ত্রিক করে তুলতে পারে, সেই আলোচনাই এখন প্রাসঙ্গিক।

৩.

সংবিধান কোন ধর্মগ্রন্থ নয়। জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তার বদল, সংশোধন হতে পারে, এমনকি জনগণ চাইলে তা পুনর্লিখনও হতে পারে। কিন্তু এও মনে রাখা দরকার, সংবিধান ঘন ঘন পরিবর্তনের বিষয়ও নয়। রেজিম চেঞ্জের সাথে সাথে সংবিধানের বারবার কাঁটাছেড়া করা হলে তা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ব্যহত করে। তবে বিগত সময়ের বিভিন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান যেভাবে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সামনে নিয়ে এসেছে, তাতে শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করার জন্য সংবিধানের কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যাপারে একটা সাধারণ আকাঙ্ক্ষা আছে। তবে এই পরিবর্তন কতটুকু হবে, কীভাবে হবে তা নিয়ে দ্বিমত আছে।

কেউ কেউ গণভোট বা নতুন গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন বা পুনর্লিখনের কথা বলছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা যেনতেন গণভোট বা নতুন গণপরিষদ নির্বাচন দিলেই যে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এমনটা বলা যাচ্ছে না। বর্তমান টালটামাল পরিস্থিতিতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বা 'সার্বভৌম অভিপ্রায়' নির্ধারণ করা দুরূহই বটে। কেননা সেই সকল অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করার জন্য যথাযথ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় করা হয়নি। কিছু এলিট বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, সেখানে কিছু সুপারিশও করা হয়েছে। তবে উপর থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দিয়ে তা দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দেয় না।

অন্যদিকে ৬৯ এর ১১ দফা, ৯০ এর দশদফার প্রতি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বেইমানি আমাদের কোন ধরনের সাধারণ চুক্তি বা কমিটমেন্টের প্রতিও অবিশ্বাস এনে দিয়েছে। সুতরাং একটা সনদে সবাই স্বাক্ষর করলেই যে নির্বাচনে জয়ী হয়ে তারা সেটা মানবে, বা সে অনুযায়ী সংস্কার/সংশোধন করবে, এমনটা বলার মত আস্থা তৈরি হয়নি।

৪.

তাহলে উপায় কি? সত্যি কথা বলতে, নিরলস গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কোন শর্টকাট নাই। কারা সংবিধানে কি পরিবর্তন চায়, কারা একদমই পরিবর্তন চায় না, সেটি স্পষ্ট হোক, জনগণ তার উপর ভিত্তি করে ম্যান্ডেট দিক। সংবিধান সংস্কার কমিশন যেসকল সুপারিশ দিয়েছে, সেগুলোতো পার্লামেন্টেই বাস্তবায়ন করা যাবে, যদি জনগণ এই সুপারিশের পক্ষ শক্তিকে বিজয়ী করে। এছাড়া অন্য যেকোন পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হলে তা দীর্ঘমেয়াদে বড় সংকট তৈরি করতে পারে।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে বা তার প্রকৃত গণতান্ত্রিক স্পিরিটকে সজীব রাখতে হলে, সংবিধান সংশোধন হোক না হোক, গণতান্ত্রিক শক্তিকে রাজপথেই থাকতে হবে। যারা বলে, যেনতেনভাবে সংবিধান বদলে ফেললেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাবে, হয় তারা নাদান কিংবা কোন দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত। রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুললে, একটা ন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে না তুললে কোনভাবেই গণতন্ত্র টেকসই হতে পারে না। বিদ্যমান সংবিধান কাঠামোর মধ্যেও যতটুকু সম্ভব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ততটুকুও গণতান্ত্রিক করা সম্ভব হয়নি এতদিন।

৫.

বাংলাদেশের মানুষ বহুদিন ধরে ভোটাধিকার বঞ্চিত। ভোটাধিকারই একমাত্র গণতন্ত্র নিশ্চিত করে না, এটা যেমন ঠিক, তেমনি জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগ ছাড়া ন্যুনতম গণতন্ত্রও নিশ্চিত করা যায় না। সংস্কার না নির্বাচন, গণপরিষদ না পার্লামেন্ট, ইত্যাদি তর্ক তুলে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগকে বিলম্বিত করার চেষ্টা হলে তা আরো সংকটকেই ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

ভোটও চাই, সংস্কারও চাই। মূল কথা হলো খাসলতের পরিবর্তন চাই! রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে যেসব খেলোয়াড় খেলেন, তাদের খাসলতের পরিবর্তন করতে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সক্রিয় ও প্রস্তুত রাখার বিকল্প নেই।

(০২.০৪.২৫)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কি নিছক প্রতারণা?

জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতারণা হিসেবে চিহ্নিত করার বয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা হয় গণশত্রু নয় গণপ্রতারক। কারো ভুজুং ভাজুং, কারো আশ্বাসে, কারো প্রলোভনে এই দেশের সাধারণ ছাত্র, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গত জুলাইয়ে রাস্তায় নামে নাই। আন্দোলনের শুরু চাকরিতে কোটা নিয়ে হলেও, ঢাবিতে ছাত্রলীগের আক্রমণের মধ্য দিয়ে তা পরিণত হয়েছিল ক্যাম্পাসগুলোকে ছাত্রলীগের আধিপত্যমুক্ত করার লড়াইয়ে। এরপর ছাত্ররা যখন শহীদ হলো, যখন আন্দোলন দমাতে গুলি চললো, তখন মানুষ চলে গিয়েছিল পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে।

আমাদের পরিচিতমুখ সাংবাদিক প্রিয়'র মাথায় গুলি খাওয়ার ফুটেজ এখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়। দূর থেকে এই ফুটেজ দেখে তো এখনো নিতে পারি না আমরা। আর যারা কাছ থেকে দেখেছে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সহযোদ্ধার মাথার খুলি উড়ে যাচ্ছে, তারা কিভাবে সয়েছে? জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে আমার পরিচিত অনেকে, যারা উত্তরা, যাত্রাবাড়ির বিভিন্ন হাসপাতাল কিংবা ঢামেকের আশেপাশে ছিল, তারা অনেকে এখনো ট্রমা কাটাতে পারে নাই।

এই ধরনের ঘটনার স্বাক্ষী যারা, তাদের পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি আমার নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখেছি। হ্যাঁ, বিভিন্ন পলিটিকাল মুভ তো ছিলো, দেশি বিদেশি নানা স্বার্থান্বেষি গোষ্ঠীও আন্দোলনে ছিল, কিন্তু কোন আন্দোলনে তা থাকে না? গত জুলাইয়ে দল মত নির্বিশেষে যেভাবে শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে বহুদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ যেভাবে দাবানলে পরিণত হয়েছিল, সেই অর্গানিক ক্ষোভ-ঘৃণা-সংহতিবোধ-জেদ-সাহস কি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব? এমন তো নয় বিগত রেজিম শুধু গত জুলাইতেই গুলি করে মানুষ মেরেছিল, এমনও নয় যে বিরোধী

বিভিন্ন দেশি বিদেশি শক্তি গত জুলাইয়ের আগে সক্রিয় ছিলো না। জুলাইয়ে গুটিকতক দলান্ধ ছাড়া সেই অসাধারন সময়ে একে অপরের সাথে সংহতি জানিয়েছিল নানা স্তরের মানুষ। মানুষ মরতে ভয় পায়নি। যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের এক বড় অংশ ছিলো, যারা সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিল না। আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের দেখেছি, যারা সাহস নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল, তারা অধিকাংশই নেমেছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, আক্রান্ত বন্ধুদের পাশে দাঁড়াতে হবে এই বোধ নিয়ে।

নিজ নিজ বোধের জায়গা থেকে, মানুষ লড়েছে, সুনির্দিষ্ট কারো ডাকে যে সব মানুষ নেমেছে, এমনটি জুলাইয়ে ঘটেনি। প্রতিটি আন্দোলনে অভ্যুত্থানে সামনে পেছনে অনেক শক্তি ইনভলভ থাকে, যারা তাদের নিজ স্বার্থ, আদর্শ, উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেই আন্দোলনকে প্রভাবিত করতে চায়, কিংবা আন্দোলন বিজয়ী হবার পর তার ফসলকে নিজ গোলায় ভরতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো, ডিপস্টেট, সিভিল মিলিটারি বুরোক্রেসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মতাদর্শিক গোষ্ঠী নিজ নিজ জায়গা থেকে সেই ফসল তুলতে চেষ্টা করে। জনগণের পক্ষের সংগঠিত শক্তি গড়ে না উঠলে যেকোন আন্দোলনে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় না, কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ঘটনাবলীও ঘটতে থাকে, এমনকি প্রতিবিপ্লবও হয়। কিন্তু সেই ঘটনাবলী মানুষের লড়াইকে খাটো করে না। এমনকি জুলাই পরবর্তীতে ভয়ংকর প্রতিবিপ্লব ঘটেও যদি যায়, যদি ফার রাইট কোন শক্তিও দীর্ঘদিন ক্ষমতা দখল করে রাখে, তাও জুলাইয়ে মানুষের আত্মদানের মাহাত্ম্য কমবে না।

জুলাইয়ে যারা পরাজিত হয়েছে, তারা নানাভাবে জুলাইকে প্রতারণা বলবে, নানা ইঙ্গিত দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে জনগণ আসলে ভুল বুঝে নেমেছিল, কিংবা বিদেশি শক্তি তাদের নামিয়ে দিয়েছে ক্ষমতা থেকে, বা ফার রাইট গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান হয়েছে কেবল,তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এরা চেরি পিকিং করে আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন বক্তব্য, আন্দোলনপরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে সামনে এনে তাদের বয়ানকে প্রতিষ্ঠিত করবে, অথচ জুলাইয়ে জনগণের সাবজেক্টিভ ভূমিকার পেছনকার তৎকালীন রেজিমসৃষ্ট বাস্তব অবজেক্টিভ কারণগুলা এড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে কিছু গোষ্ঠীও নিজেদের স্বার্থে আন্দোলনের স্টেকের সিংহভাগ দাবি করে, দেশি-বিদেশি শক্তিকে ম্যানেজ করে ক্ষমতার বিভিন্ন সমীকরণ মিলিয়ে, জুলাইকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবে। অনেকে জুলাইকে

বিক্রি করবে, নিজের আখের গুছাবে। এগুলো কোনটাই অস্বাভাবিক না। এটাও স্বাভাবিক যে, শিক্ষার্থী ও মানুষের একটা বড় অংশ জুলাই পরবর্তী সময়ে তাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন না হওয়াতে তীব্রভাবে হতাশ হবে। যেকোন গণআন্দোলনের পরে এ ধরনের হতাশা আমরা আগেও দেখেছি।

কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বুঝদার একশ্রেণির লোকজন যেভাবে 'জুলাইয়ে ছিলাম' বলে আবার জুলাইকে গণপ্রতারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এজেন্ডা নিয়ে নেমেছেন, তারা কোন নির্দিষ্ট ঘরানার কিছু মানুষের বাহবা পাবেন বটে, কিন্তু দিনশেষে পরাজিতদের সারিতেই তাদের নাম লেখা থাকবে।

(০৩.০৭.২৫)

জুলাইকে ধারণ করেই সংকট অতিক্রম করতে হবে

গতবছর জুলাইয়ে কোন একক ইশতেহার দেখে মানুষ রাস্তায় নামেনি। স্বৈরাচারের পতনের পর ক্ষমতাপ্রশ্নের কি হবে সে বিষয়ক কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ছাড়াই মানুষ নেমেছিলো। মানুষের নানামাত্রিক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিলো বটে, কিন্তু মূর্তভাবে এক দফা, অর্থাৎ স্বৈরাচারী রেজিমের পতনই ছিলো আশু লক্ষ্য। কোন বিপ্লবী কর্মসূচি, কোন মূর্ত রাজনৈতিক এজেন্ডা সেভাবে জনগণের সামনে ছিলো না। মানুষ সাময়িক যে লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিলো, বিগত রেজিমের পতনের মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হয়েছিলো। সে অর্থে মানুষ কোন রাজনৈতিক শক্তির উপর নির্ভর না করে, নিজেই সক্রিয় কর্তাসত্তা হয়ে তার আশু লক্ষ্য আদায় করে নিয়েছিলো। যারা নেমেছিল, ভুল বুঝে নামেনি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই নেমেছিল এবং নামার অর্থ হচ্ছে বিগত রেজিমের পতনকে বেগবান করা, তা নিয়ে কোন সংশয় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ছিলো বলে আমার মনে হয়নি।

কিন্তু রেজিমের পতনের পর ক্ষমতায় কারা আসবে, কোন প্রক্রিয়ায় আসবে, কোন পথে আগামীর বাংলাদেশ চলবে তা নিয়ে অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক দল, সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কনসেন্সাস ছিল না,বছর ঘুরলেও সেই কনসেন্সাস তৈরি হয়নি, হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক হতো। মোটাদাগে বৈষম্যবিরোধী গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে একমত হলেও তার মূর্তরূপ কেমন হবে তা নিয়ে ভয়ানক ভিন্নমত আছে। কিছু কিছু মত এতই বিপরীতমুখী যে তাতে আশু সমাধানের কোন উপায় দেখি না। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে জনগণ আর কর্তাসত্তার ভূমিকায় থাকতে পারছে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, সিভিল মিলিটারি বুরোক্রেসি, দেশি বিদেশি নানা ইন্টারেস্ট গ্রুপ এখন সক্রিয় তাদের মত করে জুলাইয়ের বয়ান তৈরি করতে এবং তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় নিজেদের স্টেক নিশ্চিত করতে।

সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যে আলাপ করছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনাবিষয়ক কিছু আলাপ আলোচনা যে সামনে আসছে তাকে আমি ইতিবাচক মনে করি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এইসব উপরকাঠামোগত আলাপের বাইরে গিয়ে অর্থনীতির ন্যুনতম গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নকে পাশ কাটানো হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে, শ্রেণিগতভাবে এক বিশাল জনগোষ্ঠী যখন পিছিয়ে থাকে, যখন তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করাই কঠিন, তখন রাষ্ট্রের প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্কার আমার কাছে সোনার পাথরবাটি বলেই মনে হয়। আবার যারা সমাজে বিদ্যমান এই বৈষম্য বজায় রেখে বা বৈষম্য নিরসনের কর্মসূচিকে সামনে না এনে প্রত্যাশা করেন যে জনগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'কর্তাসত্তা' হয়ে উঠে রাষ্ট্র গঠনের 'গাঠনিক ক্ষমতা'র চর্চা করতে পারবে, তারা হয় ইউটোপিয় ভাবনায় মগ্ন কিংবা তারা নিজেদের অভিপ্রায়কে জনগণের অভিপ্রায় হিসেবে চালিয়ে দিতে চান। বাস্তবতা হলো এই, পুরনো ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ 'নতুন বন্দোবস্ত' করার মত বিপ্লব বা অভ্যুত্থান বাংলাদেশে হয়নি। সেটা করতে হলে সেই কর্মসূচিভিত্তিক জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন। সেই অর্থে, প্রকৃত 'নতুন বন্দোবস্ত' কায়েমের সংগ্রাম চলছে, এবং সেই ব্যবস্থা কায়েমের জন্য আরো বহুপথ পেরোতে হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'নতুন বন্দোবস্ত' দিয়ে যেতে পারবে না, বড়জোর পুরনো বন্দোবস্তের মধ্যেই কিছু উপরিকাঠামোগত সংস্কার করার ব্যাপারে একটা ঐক্যমত্য তৈরি করে নির্বাচন দেবে এটুকুই তাদের কাজ। এত এত মানুষের আত্মদানের বিনিময়ে অন্তত পক্ষে ভোটাধিকার এবং ন্যুনতম গণতান্ত্রিক কিছু প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা দরকার। সেটুকু হলেও পরের ধাপ কীভাবে আমরা অতিক্রম করব তা ভবিষ্যতের লড়াই সংগ্রামের মধ্যে নির্ধারিত হবে।

আরেকটি বিষয়, প্রশ্ন আসে বর্তমান ইন্টেরিম সরকার কেমন দেশ চালাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে, এই সরকারের ভালোভাবে দেশ চালানোর কথাও না। সিভিল সোসাইটির মানুষেরা হুট করে এসে যদি দেশকে সুন্দরভাবে চালাতে পারতেন, তাহলে দেশে আর ডেমোক্রেসি বা রাজনৈতিক দলের দরকার কি? এই সরকার একটা ইন্টেরিম বা সাময়িক সময়ের সরকার। দেশি বিদেশি পাওয়ারের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রভাবে ও সমর্থনে এই সরকার টিকে আছে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পাওয়ার ভ্যাকুয়ামের একটা সাময়িক সমাধান হিসেবে। ভবিষ্যতের পাওয়ার কোশ্চেন সেটেল এখনো পুরোপুরি

হয়নি, কি প্রক্রিয়ায় কারা কিভাবে আগামী দিনে রাষ্ট্রের ক্ষমতার অংশীদার হবে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, প্রকাশ্য ও গোপন সেই আলাপই চলছে বলে মনে হয়।

যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই ধরনের ভ্যাকুয়াম থাকে, তখন বিভিন্ন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রগতিশীল দলগুলোর দ্বিধাবিভক্তি, বিভ্রান্তি, জনবিচ্ছিন্নতা, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র মূল্যায়নে সৃজনশীল ভূমিকা রাখতে না পারা, কতকক্ষেত্রে লেজুরবৃত্তি ও পরনির্ভরতা গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই সুযোগে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো নানামাত্রায় সংগঠিত হয়েছে, এবং ক্ষমতার আশেপাশে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মব সন্ত্রাস, মোরাল পুলিশিং, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক উসকানি, নারীবিদ্বেষী কার্যক্রম, এসব নিয়ন্ত্রনে ইন্টেরিম সফল হয়নি, বরং অনেকক্ষেত্রে উস্কানি দেয়া হয়েছে উপর মহল থেকে। ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও এসব বিষয়ে পরিস্কার অবস্থান নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের আওয়ামী বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করার নামে খোদ মুক্তিযুদ্ধকেই বিতর্কিত করার প্রচেষ্টাও আমরা দেখছি। ইন্টেরিম সরকারকে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করার তৎপরতাও চালু আছে। কিন্তু এইসব বিষয়গুলোও কিন্তু বিনা প্রতিরোধে পার পাচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী প্রগতিশীল অংশই দক্ষিণপন্থীদের এইসব তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এই সংগ্রাম প্রগতিশীলদেরই চালিয়ে যেতে হবে।

ইন্টেরিমকে বা গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী শাসকগোষ্ঠীকে ব্ল্যাংকচেক দেয়ার দায় নেই গণঅভ্যুত্থান সমর্থক প্রগতিশীল শক্তির। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানকে রক্ষা করার দায় আছে, জুলাইয়ের স্টেক জনগণকে কিছুটা হলেও বুঝিয়ে দেয়ার জন্য লড়াই করার দায় আছে। এই দায় থেকে পিছু হটা মানে দক্ষিণপন্থী শক্তিকে ওয়াকওভার দেয়া। গণ অভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তি এবং ফার রাইট অংশ উভয়েই দাবি করে যে, এই আন্দোলন কেবল ফার রাইটের আন্দোলন, তারাই ছিলো আন্দোলনের মূল শক্তি। জুলাইয়ে জনগণের মরণপণ লড়াইকে শ্রদ্ধা করে, জুলাইয়ের জনগণের আত্মদানকে বৃথা না যেতে দেওয়ার লক্ষ্যে করা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফার রাইট ও জুলাইয়ে পরাজিতদের এই বয়ানকে পরাস্ত করতে হবে। আর যারা গণ অভ্যুত্থানে দৃঢ়ভাবে অংশগ্রহণকারী এবং গণঅভ্যুত্থান ধারণকারী প্রগতিশীল অংশকে নানা ট্যাগ দিচ্ছেন, তারা জেনেবুঝে অথবা না বুঝেই ফার রাইট ও আওয়ামীপন্থীদের বয়ানকে শক্তিশালী করছেন।

সামান্য বুদ্ধিতে আমি যা বুঝি তা হলো, আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহ্য, জাত-পাতবিরোধী সংগ্রাম, সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম, স্বাধীন দেশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা থেকে জুলাই বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তাই জুলাইকে ধারণ করেই জুলাইপরবর্তী সময়ের সংকটগুলোকে কাটিয়ে উঠতে দ্বিধাহীন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

(০৪.০৭.২৫)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি ও সংস্কার প্রসঙ্গ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পার হয়ে গেলো। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও এক বছর পূর্ণ করেছে। নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষিত হয়েছে। এই সময়ে এসে আমরা গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণা করছি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসাবনিকাশ করছি। অন্তবর্তী সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

এক বছর পর এসে কেউ এই গণ-অভ্যুত্থানকে 'বেহাত বিপ্লব' বলছেন। কেউ বলছেন, সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ মব সন্ত্রাস, দক্ষিণপন্থীদের উত্থান, সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির নানা হস্তক্ষেপের কারণে নানামাত্রিক আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। কেউ আবার রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর কিছু সংস্কারে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ ও ঐকমত্যকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন।

গণ-অভ্যুত্থানের হিস্যা নিয়ে রাজনৈতিক পক্ষগুলো একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছে। অন্যদিকে পতিত স্বৈরাচার আবার রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এইসব ডামাডোলে মূল প্রশ্নটিই হারিয়ে যাচ্ছে। এত রক্তপাত, এত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে গণ-অভ্যুত্থান রচিত হলো, সেই আত্মত্যাগের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কাজটি কি অগ্রসর করা সম্ভব হয়েছে?

এটা ঠিক যে গত বছর জুলাই জাগরণে কোনো একক ইশতেহার দেখে মানুষ রাস্তায় নামেনি। রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী মানুষের নানামাত্রিক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল বটে, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনের পতনই ছিল আশু লক্ষ্য। জনগণের সামনে ছিল না কোনো বিপ্লবী কর্মসূচি, কোনো মূর্ত রাজনৈতিক এজেন্ডা। মানুষ সাময়িক যে লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিল, স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী শাসকের পতনের মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হয়েছিল।

এমনকি স্বৈরাচারের পতনের পর ক্ষমতা-প্রশ্নের কি হবে, সে-বিষয়ক কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ছাড়াই মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। সে অর্থে মানুষ কোনো রাজনৈতিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে নিজেই সক্রিয় কর্তাসত্তা হয়ে তার আশু লক্ষ্য আদায় করে নিয়েছিল। যাঁরা নেমেছিলেন, তাঁরা ভুল বুঝে নামেননি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই নেমেছিলেন; নামার অর্থ হচ্ছে সেই স্বৈরাচারী শাসকের পতনকে বেগবান করা; তা নিয়ে কোনো সংশয় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ছিল না। কিন্তু শাসকের পতনের পর ক্ষমতায় কারা আসবে, কোন প্রক্রিয়ায় আসবে, কোন পথে আগামীর বাংলাদেশ চলবে, তা নিয়ে অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক দল, সমাজের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কোনো পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট ঐকমত্য ছিল না বলে মনে হয়।

বছর ঘুরলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কনসেন্সাস তৈরি হয়নি। হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক হতো। তবে মোটাদাগে গণমানুষের মধ্যেও্রবিশেষত ছাত্র-তরুণদের মধ্যে বৈষম্যবিরোধী অবস্থান থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল, যার নিদর্শন আমরা পাই বিভিন্ন স্লোগান ও গ্রাফিতিতে। এই বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার কথা রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো সবাই কম বেশি স্বীকার করলেও, সেই ধরনের রাষ্ট্রের মূর্তরূপ কেমন হবে তা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভয়ানক ভিন্নমত আছে। কিছু কিছু মত এতই বিপরীতমুখী যে তাতে আশু সমাধানের কোনো উপায় নেই।

এই ভিন্নমত থাকাটা অস্বাভাবিক নয়, গণতান্ত্রিক সমাজে মতামতের এই বৈচিত্র্য কাম্যও বটে। কিন্তু সংকট হলো, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রয়নের প্রশ্নগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে এসে জনগণ আর কর্তাসত্তার ভূমিকায় থাকতে পারছে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি, দেশি-বিদেশি নানা ইন্টারেস্ট গ্রুপ এখন সক্রিয় তাদের মতো করে জুলাইয়ের বয়ান তৈরি করতে এবং তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় নিজেদের হিস্যা নিশ্চিত করতে। এখানেই আসছে প্রতিবিপ্লব বা বেহাত বিপ্লবের প্রশ্ন। ব্যাপকতর জনগণ কর্তাসত্তা হয়ে উঠে স্বৈরাচারকে ক্ষমতাচ্যুত করল ঠিকই, কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্নে তাদের আকাঙ্ক্ষা বা অভিপ্রায় কি প্রতিফলিত হচ্ছে?

আমাদের রাজনীতিতে নানা মত ও বয়ান হাজির থাকলেও, এই কথা বলা যেতে পারে যে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সময়ের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এ যাবৎকালের কোনো 'সরকার' সত্যিকারের 'গণতান্ত্রিক' উপায়ে দেশকে পরিচালনা করেনি বা করতে পারেনি। বাংলাদেশে নির্বাচিত, অনির্বাচিত, জালিয়াতি করে 'নির্বাচিত', সেনাসমর্থিত, সরাসরি সামরিক শাসন, রাষ্ট্রপতিশাসিত, প্রধানমন্ত্রীশাসিতসহবিভিন্ন ধরনের সরকার আমরা দেখেছি।

আমাদের সংবিধানেও অনেকবার কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। আর সেসব করা হয়েছে কখনো অধ্যাদেশের মাধ্যমে, কখনো-বা 'নির্বাচিত' সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। কিন্তু সেই সংশোধনীগুলো জনগণের মতামত, আকাঙ্ক্ষা বা অভিপ্রায়ের প্রকৃত প্রতিফলন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এমনকি গণভোটের নামে যে হ্যাঁ/না ভোট হয়েছিল, তার ফলাফলেই স্পষ্ট যে তাতে সবার মতামতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেনি। আবার দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভোটাধিকার বঞ্চিত থাকায়, ভোটাধিকারকেই আমরা অনেকে গণতন্ত্রের সমার্থক মনে করছি।

ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারা গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্ত তো বটেই, এই ন্যূনতম অধিকারকে নিশ্চিত তো করতেই হবে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এটিও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনই গণতন্ত্রের শেষ কথা নয়। অপেক্ষাকৃত 'ভালো নির্বাচন'-এ বিজয়ী রাজনৈতিক দলও সরকার গঠন করে অগণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে, তা করেছেও। এসব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই জুলাই-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় আমরা কতটুকু এগিয়েছি, এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার।

গণতন্ত্র মানে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়, রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রান্তিক স্বরগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করাও গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের প্রশ্নের সঙ্গে তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে অন্তত নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে জাতিগত, ধর্মীয়, লিঙ্গীয়, শ্রেণিগত বৈষম্য নিরসনের প্রশ্ন। এই নাগরিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তুললেই চলে না, বৈষম্য নিরসনের প্রয়োজনে ইতিবাচক বৈষম্যও করতে হয়, প্রান্তস্থিত স্বরগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হয়। এই প্রশ্নকে সামনে না আনতে পারলে সংবিধানের যতই কাটাছেঁড়া করা হোক না কেন, রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোগত

পরিচালনার ক্ষেত্রে যতই ঐকমত্য স্থাপিত হোক না কেন, সংবিধানের মূলনীতিতে যাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করে তোলা সম্ভব নয়।

দীর্ঘদিনের অগণতান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য অভিঘাতে সমাজদেহে জাতিবাদী ও বৈষম্যমূলক যে বয়ানগুলো বাসা বেঁধেছে, তার বিপরীতে অন্যান্য বয়ান তৈরির কাজ রাষ্ট্র সরাসরি করবে না ঠিকই, কিন্তু সেই বৈষম্যবিরোধী বয়ান যখন সমাজের ভেতর থেকেই গড়ে ওঠে, তখন তার বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অথচ জুলাইয়ের পরেও আমরা দেখেছি জাতিবাদী ও বৈষম্যবাদী বিভিন্ন বয়ানের সমর্থনে এবং পেশিশক্তির জোরে প্রান্তিক স্বরগুলোকে দমন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

বরং বর্তমান সরকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে যাদের আমরা দেখছি, তাদের অনেকেই অগণতান্ত্রিক পন্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দমনের চেষ্টা করেছেন। যখন বিভিন্ন স্থানে মব সন্ত্রাস চালানো হয়েছে, মাজার ভাঙা হয়েছে, ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে হামলা করা হয়েছে, নারীদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে, মোরাল পুলিশিং করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে জুলাই-পরবর্তী সরকারের ব্যর্থতা ও ক্ষেত্রবিশেষে উদাসীনতা হতাশাজনক। এই পরিস্থিতির মধ্যেও রাষ্ট্রের 'সংস্কার' প্রশ্নটি এই এক বছরে বারবার সামনে এসেছে।

জুলাই-পরবর্তী সময়ে শাসনব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনাবিষয়ক কিছু আলাপ-আলোচনা যে মানুষের সামনে আসছে তা ইতিবাচকরূপে দেখা যেতে পারে। তবে রাষ্ট্রপরিচালনায় উপরকাঠামোগত কিছু সংস্কারের প্রশ্নেই এই আলাপ সীমাবদ্ধ।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান যেহেতু কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জনগণের সামাজিক বিপ্লব নয়, সুতরাং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর এই পরিস্থিতিতে সম্ভবপর নয়ড়সেই বিষয়টিও নিশ্চয়ই বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যেকোনো মানুষই বুঝবেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য যে গণমানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যেসব গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রয়োজন, সে প্রসঙ্গগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারেই অনুল্লেখিত থেকেছে।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন হয়নি, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ কেমন হওয়া উচিত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তোলা যায়, এ বিষয়

উপেক্ষিত থেকেছে। প্রান্তিক মানুষ কীভাবে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে, সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারের আলোচনা সামনে আসেনি।

শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম অধিকার ও মজুরি নিশ্চিত করা, ব্যাপকতর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকবান্ধব সংস্কার করা, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্যশীল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক দাদাগিরি ও মোড়লিপনার বিপরীতে জাতীয় স্বার্থে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এখনো জানতে পারিনি।

এই বিষয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রেখে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর করা সম্ভব কিনা এই আলাপকেও আমরা সামনে আনতে পারিনি। অর্থনৈতিকভাবে, শ্রেণিগতভাবে যখন এক বিশাল জনগোষ্ঠী পিছিয়ে থাকে, রাষ্ট্র যখন ব্যাপকতর জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না, যখন তাদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা থাকে না, যখন সকল জনগোষ্ঠীর বিকাশের ন্যূনতম সুযোগ রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে না, তখন উপরিকাঠামোর কিছু সংস্কার করে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর কীভাবে সম্ভব?

অন্তবর্তীকালীন সরকার এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে পারবে না, তার সেই সুযোগও নেই। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো যে মোটাদাগে অনুল্লেখিতই থেকে গেলো সে আলাপ আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে তো নয়ই, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মধ্যেও জোরেসোরে উঠতে দেখলাম না।

সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে বজায় রেখে কিংবা বৈষম্য নিরসনের কর্মসূচিকে সামনে না এনে কেউ যদি প্রত্যাশা করেন যে জনগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'কর্তাসত্তা' হয়ে উঠে তার অভিপ্রায় বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠনের 'গাঠনিক ক্ষমতা'র প্রয়োগ ঘটাতে পারবে, তাহলে সেই ভাবনা কতটুকু বাস্তবসম্মত সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

পুরোনো ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ 'নতুন বন্দোবস্ত' করার মতো বিপ্লব বা অভ্যুত্থান বাংলাদেশে হয়নি। সেটা করতে হলে সে ধরনের কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন।

‘নতুন বন্দোবস্ত’ কথাটিকে আমরা যদি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করি, তাহলে সেই রূপান্তরের সংগ্রামকে বিজয়ী করতে হলে আমাদের এখনো বহু পথ হাঁটতে হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়তো এই কাজটি সম্পন্ন করে যেতে পারবে না; তাদের কাছে এ প্রত্যাশা করাও সম্ভব নয়।

এই সরকার কিছু উপরিকাঠামোগত সংস্কার করার ব্যাপারে একটা ঐকমত্য তৈরি করে নির্বাচন দেবে–এরকমই আলামত দেখা যাচ্ছে। এই পর্বে অন্ততপক্ষে ভোটাধিকার এবং ন্যূনতম গণতান্ত্রিক কিছু প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও যদি আমরা সফল হতে পারি, তাহলে সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য প্রকৃত ‘বৈষম্যবিরোধী’ কর্মসূচিকে এখন থেকেই সামনে আনা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সে কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করতে আরও বহুপথ হাঁটতে হবে আমাদের।

(০৮.০৮.২৫)

নিওলিবারেল যুগের নয়া ফ্যাসিবাদ

১.

নিওলিবারেল গ্লোবালাইজেশনের নামে বহুজাতিক পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে আমরা নিরানব্বই শতাংশ মানুষ নানাভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বেঁচে আছি। আবার আমরাই ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত রকমারি পণ্যের ভোক্তা। একদিকে আমরা পণ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, পণ্য আমাদের আসক্ত করে ফেলছে, অন্যদিকে আমাদের সৃষ্ট পণ্যই আমাদের উপর খবরদারি চালাচ্ছে।

২.

'প্রতিযোগিতাসর্বস্ব' এই বিশ্বব্যবস্থায় প্রজাতি স্বত্তা হিসেবে আমাদের জীবন পুনরুৎপাদনের যে দায়, সে দায় মেটাতে আমাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগকে শারীরিক মানসিক শ্রমদাসত্ব করতে হচ্ছে, 'ভালোভাবে বাঁচা'র জন্য মানবিক আনন্দটুকুকে কবর দিয়ে আমরা প্রাণপণে ওভারটাইম খাটছি (কেউ খাটছে খাবারের বাড়তি মূল্যের জোগাড় করতে, কেউ সন্তানের পড়াশোনার খরচ মেটাতে, কেউবা নতুন মডেলের ফোন কিনতে!)!

৩.

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, গিগ অর্থনীতির এ যুগে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের প্রক্রিয়াটি এতটাই জটিল ও অদৃশ্য হয়ে পড়ছে যে, আমরা আমাদের উপর জেঁকে বসা ব্যবস্থাটার স্বরূপ বুঝে উঠতে পারছি না। এই যে ধরুন, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা বিনামজুরিতে অন্যের মুনাফার জন্য শ্রম দিচ্ছি, অথচ টের পাচ্ছি না। দিনশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যখন মোবাইল হাতে নিচ্ছি বিনোদনের আশায়, তখনও আমরা একই সাথে

ভোক্তা ও বিনামজুরির শ্রমিকে পরিণত হয়ে পুঁজির সেবা করছি। এই বাস্তবতা এক সাধারণ বৈশ্বিক বাস্তবতা।

৪.

পুঁজিবাদী বিশ্বের সাধারণ বৈশ্বিক বাস্তবতার বাইরেও আমাদের দেশের মত প্রান্তস্থিত দেশগুলোতে নিওলিবারেল পুঁজি বিশেষ বাস্তবতা তৈরি করেছে। শ্রমশক্তি সস্তা হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষ দেশি বিদেশি উভয় পুঁজি দ্বারা দ্বিগুন শোষিত হচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়া মানুষদের বিরাট অংশ ইনফর্মাল সেক্টরে, স্বনিয়োজিত খাতে শ্রম দিচ্ছে। অনেকে বিদেশে চলে যাচ্ছে সস্তায় শ্রম বেচতে। স্বাধীন অর্থনীতির বিকাশ হতে না পারায় পুঁজির শোষণ এখানে অনেকক্ষেত্রেই প্রকাশ্য এমনকি দৃষ্টিকটু।

৫.

এদেশে পুঁজিবাদী শোষণ অনেকটা প্রকাশ্য হলেও, এর বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারছে না। কৃষিতে পুঁজিবাদের দাপুটে প্রবেশ, মালিকানা সম্পর্কের বদল, আমাদের সমাজের মধ্যে যৌথতাবোধ, সহমর্মিতার যে জায়গা ছিলো, তা প্রবলভাবে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তা এদেশে গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। ফলে প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, বিভিন্ন তরিকা ও বিশ্বাসের মানুষরা ভালনারেবল থেকে গেছে এবং এই সুযোগে তারা ঘৃণাচর্চার সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

৬.

এদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাব্যবস্থা বিভাজিত। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে নিওলিবারেল দর্শনের উপযোগী করে সাজানো হয়েছে, যে শিক্ষা কেবল ভোক্তা হতে শেখাচ্ছে। বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় করে ফেলা হচ্ছে। মানবিক মানুষ তৈরি করা আর শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বাজারব্যবস্থার একনিষ্ঠ সেবক ও ভোক্তা তৈরি করা।

৭.

জীবন ও শ্রমশক্তিকে টুকরো টুকরো করে বেচেও এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তও ঠিক 'বাঁচতে' পারছেনা, আমাদের সামগ্রিক হতাশাকে সুকৌশলে ডাইভার্ট করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ঘৃণাবাদী ও বিভাজনবাদী বয়ানের মধ্য দিয়ে। এই বয়ানের দাপটে প্রকাশ্য শ্রমশোষণকেও আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। নিওলিবারেল মুখোশে বহুজাতিক পুঁজি নিজের চরিত্রকে আড়াল করে রেখে নিশ্চিন্তে স্ফীত হচ্ছে বিনা প্রতিরোধে।

৮.

এইরকম একটা আর্থসামাজিক বাস্তবতাই নয়াফ্যাসিবাদের জন্য উর্বরভূমি। নিওলিবারেল মুখোশে পুঁজিবাদ নিজেকে আড়াল করতে সমাজে যে কৃত্রিম বিদ্বেষ ও বিভাজন তৈরি করে রাখছে, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচয়বাদী রাজনীতির নামে উগ্র জাতিবাদ, ঘৃণা ও বিভাজনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা উগ্র ডানপন্থা বেড়ে চলছে। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, বরং তীব্র বৈষম্য, নির্লজ্জ প্রকাশ্য শোষণ, বেকারত্ব ইত্যাদি এদেশে উগ্র ডানপন্থাকে আরো জ্বালানি যোগাচ্ছে।

৯.

অসংগঠিত মানুষের বিচ্ছিন্নতাসৃষ্ট সামগ্রিক হতাশার বিকৃত রূপ উগ্রতা ও বিদ্বেষ আকারে প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্নভাবে। একদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার এলগরিদম উগ্র বিভাজনমূলক বয়ানগুলোকে 'ভাইরাল' করে তুলছে। বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের পরনির্ভরশীলতা, পালটা বয়ান তৈরির অক্ষমতা, বিভিন্নব্যর্থতা ও দুর্বলতাও এ জন্যে কম দায়ী নয়। নয়া ফ্যাসিবাদ এভাবেই তার জমিন খুঁজে নিয়েছে।

১০.

বাস্তবতা হলো এই জমিনেই বেড়ে উঠছে আমাদের নতুন প্রজন্ম, জেন জি ও জেন আলফা! ফলে এই ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ নতুন প্রজন্ম বিদ্রোহ করলেও, সে বিদ্রোহ ফ্যাসিবাদের ভিত্তিভূমিকে ধ্বংস করতে তো পারেইনি, বরং এর এক বড় অংশ নতুন ফ্যাসিবাদী বয়ানে বিভ্রান্ত হয়েছে। তবু রাষ্ট্রের নির্মম দমন পীড়নের মুখে, আত্মত্যাগ করার সাহস দেখিয়ে এই প্রজন্ম ভবিষ্যতের লড়াইয়ের প্রেরণাও জুগিয়েছে। সেই সাথে এই শিক্ষাও দিয়েছে

যে, ফ্যাসিবাদী আর্থসামাজিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকলে কেবল শাসকের পরিবর্তন ফ্যাসিবাদের পতন ঘটাতে পারে না।

১১.

বর্তমান লড়াই নয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, নয়া ফ্যাসিবাদের আঁতুড়ঘর নিওলিবারেল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই। বিভাজনের সংকীর্ণ পরিচয়বাদী রাজনীতির বিপরীতে শ্রমজীবী মানুষ, নিপীড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়েই এই লড়াইকে অগ্রসর করতে হবে।

(২৯.১০.২৫)

জুলাই সনদ ও বামপন্থীদের নীতিনিষ্ঠ অবস্থান

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করা হলো। নয় মাস ধরে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর শেষদিকে অনেকটা তড়িঘড়ি করে, এবং এর বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত আলোচনা অমীমাংসিত রেখেই সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান করা হলো। প্রধান উপদেষ্টা অত্যন্ত আনন্দের সাথে বললেন, এই সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আমরা বর্বরতা থেকে সভ্যতার জগতে এসেছি! একসময় ব্রিটিশরা এসে যেমন আমাদের 'সভ্য' করেছিলো, এখনো পশ্চিমারা দেশে দেশে গণতন্ত্র ফেরি করার নামে নয়া উদারবাদের আড়ালে নয়া উপনিবেশ স্থাপন করে 'বর্বর'দের 'সভ্য' বানানোর প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত ঐকমত্য কমিশন সেভাবে আমাদের 'সভ্য' বানিয়েছেন বলে মনে করছেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

সভ্যতার নিদর্শন (!) এই জুলাই সনদে এতদিন 'বর্বর' হয়ে থাকা জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় অবশ্য ঠাঁই পায়নি। সরকার শিক্ষা ও কৃষির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্কার করার মত কোন প্রয়োজন মনে করেননি, তাই সে বিষয়ে কমিশনই গঠন করেননি। আবার শ্রম, নারী, পুলিশ ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করলেও তার কোন সুপারিশ ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারেনি। যেহেতু বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণের বিষয়টি কেবল শাসনতান্ত্রিক(!), তাই মৌলিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখেই সংবিধান ও শাসনপদ্ধতির উপরিকাঠামোয় কিছু সংস্কার করলেই দেশ নতুন সভ্যতায় প্রবেশ করবে, ফ্যাসিবাদের মূলোৎপাটন ঘটবে, রাষ্ট্র আপনা আপনি গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে, এমন বয়ানই তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে।

সিপিবিসহ চারটি বামপন্থীদল এবং এনসিপি এই বহুল আলোচিত জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেনি। বামপন্থী দলগুলো এবং এনসিপি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই সনদে স্বাক্ষর করেনি। এনসিপি মূলত চায় চায় জুলাই সনদে উত্থাপিত ভিন্নমতগুলোকে নির্বাচনের আগেই গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে পরবর্তী জাতীয় সংসদকে গণপরিষদ বা সংস্কার সভার ক্ষমতা দিয়ে নতুন '২৬'-এর সংবিধান রচনা করতে। তাদের মূল ভাবনাজুড়ে আছে কেবল সংবিধান। তাদের কাছে সংবিধানই হলো ফ্যাসিবাদের মূল ভিত্তি। বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে সংবিধান বদলাতে পারলেই দেশে ফ্যাসিবাদ নির্মূল হয়ে যাবে, এরকম অলীক কল্পনার জগতে তারা বাস করে। অথচ 'বৈষম্যবিরোধী' ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া ছাত্রনেতারা যখন 'নতুন বন্দোবস্ত'- এর কথা বলে দল তৈরি করেছিলেন, তখন কেউ কেউ তাদের কাছে অনেক আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের নতুন বন্দোবস্ত উপরিকাঠামোর কিছু বদলের নামে জনস্বার্থমূলক বিষয়গুলোর আমূল পরিবর্তনের ইস্যুকে আড়াল করে পুরনো ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখারই বন্দোবস্ত। সুতরাং পুরনো ব্যবস্থার দলগুলোর সংস্কারের বয়ান এবং বর্তমান ইন্টেরিম আবিষ্কৃত 'সভ্যতা'র বয়ানের সাথে তাদের খুব বেশি দূরত্ব নেই। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে মতপার্থক্য দূর হলে তারাও জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে বলে জানিয়েছে।

অন্যদিকে সিপিবিসহ চারটি বামপন্থী দল জুলাই সনদে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বিষয়ে তাদের আপত্তি বারবার জানিয়েছে। তারা বারবার বলেছেন, সব দলের ঐকমত্য হওয়া বিষয়গুলোই কেবল জুলাই সনদের মূল অংশে থাকতে পারে, প্রয়োজন হলে ভিন্নমতগুলো অতিরিক্ত (অ্যানেক্স) প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা যেতে পারে। কমিশন এই প্রস্তাব আমলে নেয়নি। এর ফলে আদর্শিকভাবে পুরোপুরি বিপরীত মেরুর বিষয়গুলোতেও 'ভিন্নমতসহ' পরোক্ষ সম্মতি দিতে দলগুলোকে বাধ্য করা হয়েছে। সংবিধানের মূলনীতিসহ অন্যান্য আদর্শিক বিষয়ে বিপরীত আদর্শিক মেরুর দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সম্ভব নয়, এই বিবেচনা থেকে এ বিষয়গুলোকে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার এজেন্ডা থেকে বাদ রাখতে বারবার অনুরোধ করলেও তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। সংবিধান সংস্কার কমিশন যে ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মত মৌলিক আদর্শিক বিষয়কে সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছিল, তাকেই ঐকমত্য কমিশন নানা কৌশলে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। এইসব মতামতের সাথে বাম দলগুলো আদর্শিকভাবেই একমত হতে পারে না।

এছাড়াও সনদের পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপন না করে ইতিহাসের একতরফা বয়ান যুক্ত করা হয়েছে। জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা মানে সেই বয়ানে একমত পোষণ করা। এছাড়াও ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা, জুলাই সনদের বিষয়ে আদালতে আপত্তি উপস্থাপন না করার অঙ্গীকার করা, এসব বিষয় গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে বলে বাম দলগুলো মনে করেছে। এছাড়াও সংবিধানের তফসিল থেকে প্রক্লেমেশন অফ ইন্ডপেন্ডেন্স, ডিক্লারেশন অফ ইন্ডেপেন্ডেন্স বাদ দেয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করেছে বাম দলগুলো। তাদের এইসব মৌলিক আপত্তির মুখে কেবলমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেও বাকি বিষয়ে ঐকমত্য কমিশন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সুতরাং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাম দলগুলোর সনদে স্বাক্ষর করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

অথচ, রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত নেই জেনেও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিকভাবেই ঐকমত্য কমিশনে আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য উপরিকাঠামোর কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার করেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে যদি কিছুটা অগ্রসর হওয়া যায়, সেটি ছিলো তাদের লক্ষ্য। তারা ঐকমত্য কমিশনে রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মত দিয়েছে, বহুক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একমত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ঐকমত্য কমিশন প্রস্তাবিত বিষয়গুলোর মধ্যে মাত্র ৯-১০টিতে সিপিবি ভিন্নমত দিয়েছে, ৬-৭টি বিষয়ে বিরত থেকেছে, বাকিগুলোতে একমত পোষণ করেছে। কিছুক্ষেত্রে আলোচনায় বামপন্থীদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সবকিছুর পরেও যদি রাষ্ট্রকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা, ক্ষমতা ভারসাম্য তৈরি করাই এই সনদের উদ্দেশ্য হত, সিপিবিসহ বামপন্থীরা তাকে সমর্থন করতে দ্বিধা করতো না। একারণে একমত না হয়েও অনেক বিষয়ে ঐক্যমতের জন্য তারা আলোচনা থেকে বিরত থেকেছে, কোন বিষয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসে একমত হয়েছে।

কিন্তু ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদের পটভূমিতে যেভাবে একতরফা ইতিহাসের বয়ান দিয়েছে, তফসিল থেকে যেভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল মুছে ফেলতে চেয়েছে, সংবিধানের মূলনীতির মত আদর্শিক বিষয় যেভাবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, সনদের

অঙ্গীকারনামায় যেভাবে হাত-পা বেঁধে দিতে চেয়েছে, তাতে বোঝা গেছে, জুলাই সনদের উদ্দেশ্য নিছক গণতান্ত্রিক সংস্কার নয়, বরং এর অন্যতম এজেন্ডা ইতিহাসের একতরফা বয়ান প্রতিষ্ঠিত করা এবং সংবিধানকে ডানপন্থী, মুক্তবাজারউপযোগী করা। এরকম হবার সম্ভাবনা আছে জেনেও বামপন্থীরা ঐকমত্য কমিশনে অংশ নিয়েছে, কেননা এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে চেয়েছে, রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর অধিকতর গণতান্ত্রয়নের এজেন্ডায় অবদান রাখতে চেয়েছে এবং জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম স্টেকহোল্ডার হিসেবে বোঝাতে চেয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল ডানপন্থীদের নয়। ঐকমত্য কমিশনের ভেতরে ও বাইরে বামপন্থীদের নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বিভিন্ন ক্ষেত্রে উগ্র ডানপন্থীদের বিভিন্ন প্রস্তাবনাকে সফল হতে দেয়নি।

কিন্তু, রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর গণতান্ত্রয়নের জন্য সংবিধানের অপারেটিভ অংশে কতক জরুরি সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে এজেন্ডায় নিয়ে এসে, ঐকমত্য কমিশন বামপন্থীদের স্বাক্ষর করার সুযোগ রাখেনি। বামপন্থীরা কোন চাপ বা প্রলোভনের মুখে আদর্শিক পজিশন সারেন্ডার করে সেখানে স্বাক্ষরও করেনি। ইতিহাসে গণপরিষদ বিতর্কে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বা মানবেন্দ্র লারমার কথা যেভাবে উল্লেখ আছে, হয়তো একসময় বামপন্থীদের এই অবস্থানও সেভাবে আলোচিত হবে। বামপন্থীরা স্পষ্ট করে বলেছে, সনদে স্বাক্ষর না করলেও ঐকমত্য কমিশনে যেসব বিষয়ে তারা একমত হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য তারা সহযোগিতা করবে। কিন্তু আদর্শিক বিষয়ে রাজনৈতিক লড়াই তারা চালিয়ে যাবে।

একথা সকলেরই উপলব্ধিতে আনা জরুরি যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান কোন নির্দিষ্ট দল বা ইশতেহার সামনে নিয়ে হয়নি। জনগণ এই গণ অভুত্থানের মূল শক্তি, জনগণের কাতারে থেকেই বামপন্থীরা এই অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অথচ দেখা গেল জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ডানপন্থীরা, কতকক্ষেত্রে উগ্র ডানপন্থী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। উগ্রডানপন্থী-মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি বুক ফুলিয়ে তাদের বয়ান শুধু প্রচার করছে তাই নয়, কতকক্ষেত্রে তা চাপিয়ে দিচ্ছে, ভিন্নমতের উপর হামলে পড়েছে।

বামপন্থীদের বড় অংশই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিলেও তারা কেন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি, তার অনেক বাস্তব কারণ আছে। একথা অস্বীকার করার উপায়

নেই যে, বর্তমানের আর্থ-সামাজিক নানা উপাদানের কারণে ডানপন্থীরা সমাজে ও রাষ্ট্রে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। বর্তমান ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, দেশি বিদেশি নানা স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথেও ডানপন্থী শক্তি নানাভাবে নিজেদের অভিযোজিত করে নিয়েছে। ফলত, ইন্টেরিম সরকারও ডানপন্থীদের মদদ দিয়েছে। এর পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, বামপন্থী দাবিদারদের এক অংশ আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ ছিলো, এক অংশ দক্ষিণপন্থীদের উত্থানের ভয়ে আওয়ামী পতনের লড়াইয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। বামপন্থী দাবিদারদের কারো কারো এ ধরনের অবস্থানের কারনে বামপন্থীদের মার্জিনালাইজ করা ডানপন্থী শক্তির জন্য সহজ হয়েছে। আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বামপন্থী দলের বহু নেতাকর্মী ১৫-১৬ বছর মার খেয়েছে, জেলে গিয়েছে, জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদদের মধ্যে বামপন্থীরাও রয়েছেন, কিন্তু সেই লড়াইকে নানাভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে আওয়ামীপন্থীরা যেমন মুক্তিযুদ্ধ ও আওয়ামী লীগকে সমার্থক হিসেবে প্রচার করেছে, একইভাবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বামপন্থীদের যেকোন অবস্থানকে আওয়ামী বয়ান হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করছে। এই সুযোগে পতিত স্বৈরাচার ও তাদের মদদপুষ্টরা নানাভাবে জুলাই অভ্যুত্থানে বামপন্থীদের অংশ নেয়ার জন্য নানাভাবে আক্রমণ করছে, সে অংশগ্রহণকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করতে চেষ্টা করছে। ইন্টেরিমের ডানঘেঁষা অবস্থান তাদের বয়ানকেও শক্তিশালী করছে।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বামপন্থীরা কিন্তু সাধ্যমতো লড়াই করছে। ডানপন্থীদের এক অংশ প্রথমেই চেয়েছিল সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলতে, মুক্তিযুদ্ধকে ৪৭ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে। এর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা লড়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামী বয়ানের বাইরে নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধকে রক্ষার লড়াই তারা করেছে এবং করে যাচ্ছে। ৭১-এর বিভিন্ন নিশানা মুছে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছে বামপন্থীরা। সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলার নামে, পুনর্লিখনের নামে তাকে ডানপন্থী চেহারা দেওয়ার আয়োজনের বিরুদ্ধেও লড়ছে বামপন্থীরা। দৃঢ় এ অবস্থানের জন্য উগ্র ডানপন্থী ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি কিছু ক্ষেত্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। তবে শক্তি ভারসাম্য অনুকূলে না থাকায়, ডানপন্থীদের বয়ান অনেকক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান করে নিচ্ছে। এই সময়ে বামপন্থীরা একই সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। করিডোর

প্রদান, বন্দরকে আলাপ আলোচনা ছাড়াই তাড়াহুড়া করে বিদেশি কোম্পানির কাছে লিজ দেওয়ার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে।

আজ বিভিন্ন মহলে বামপন্থীদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নানাদিক থেকে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। বামপন্থীরাও জনগণের কাছে নিজেদের অবস্থান ভালোভাবে তুলে ধরতে হয়তো কিছুক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও বামপন্থীদের এই নীতিনিষ্ঠ অবস্থান, ভবিষ্যতে জনগণের লড়াইকে আরো এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে, এ প্রত্যাশা করাই যায়।

(২৫.১০.২৫)

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট প্রসঙ্গে

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের দাবিটা এদেশে বামপন্থীরাই জোরেশোরে তুলেছিলো। কিন্তু সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে উচ্চকক্ষ করতে হবে, এইরূপ দাবি তারা করে নাই। বর্তমান পরিস্থিতির জটিলতা বিবেচনায় তারা দ্রুততম সময়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন বিষয়ক সংস্কার সম্পন্ন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার কথা বলেছিলো। ঐকমত্য যতটুকু, ততটুকু সংস্কার, এটুকু ছিল কথা। এর বাইরে কিছু করতে গেলে তা চাপিয়ে দেওয়া হবে, যা দেশকে আরো অস্থির করে তুলবে, গণতান্ত্রিক পথে ফেরার রাস্তাটা আরো কণ্টকাকীর্ণ হবে, একথাই বলেছিল বামেরা।

এই সরকার উপর থেকে যখন উচ্চকক্ষ চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, তখন বামপন্থীরা বলেছে এ মূহুর্তে এটি অপ্রয়োজনীয়। তারা বলেছিল, নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, সকল শ্রেণির মানুষের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচনে ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দলগুকোই একচেটিয়া সুবিধা পাবে। এ ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষ গঠন হলে, তা ধনিক শ্রেণির বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে পার্লামেন্টের সদস্য বিক্রির আরেকটা জায়গা হবে মাত্র, ক্ষমতার ভারসাম্য হবে না।

অথচ বামপন্থীরা একসময় যে সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিল, তাতে প্রতিটি দলকে ক্রমানুসারে প্রার্থী ঘোষণা করতে হত, ভোটের অনুপাত অনুযায়ী ক্রমানুসারে প্রাপ্য আসন সেই প্রার্থীরা পেত। সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদে বসত আইনসভার সদস্য হিসেবে, কেবল আইন প্রণয়নের জন্য। দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের কর্মসূচি দিত, সেই কর্মসূচিতে জনগণ সমর্থন দিলে তাদের ভোট দিয়ে বেশি প্রার্থী নির্বাচিত করত। সংসদ সদস্যদের কাজ হতো ম্যান্ডেট অনুযায়ী পলিসি মেকিং। কিন্তু সেটি করার আগে

স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়িত করা ছিলো বামপন্থীদের দাবি। স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম থাকবে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের হাতে, তাহলে আসনভিত্তিক এমপির প্রয়োজন থাকবে না। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ হবে। কিন্তু এমপিদের স্থানীয় পর্যায়ে খবরদারি করার সুযোগ রেখে, আসনভিত্তিক ব্যবস্থা বজায় রেখে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন কোন অর্থ বহন করে না।

এরপরেও বিদ্যমান ব্যবস্থাতে সত্যি সত্যি ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য থাকলে উচ্চকক্ষ এমনভাবে সাজানো প্রয়োজন ছিলো, যাতে সমস্ত শ্রেণিপেশা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি যাতে পার্লামেন্টে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা, নারীদের উচ্চকক্ষে অন্তত ৫০ ভাগ আসন নিশ্চিত করা। তা না করলে মূলত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের অনুগামীরাই এই উচ্চকক্ষে যাবে। মানুষের কাছে না গিয়ে, গণবিরোধী লোকেরাও অর্থ ও আনুগত্যের বিনিময়ে উচ্চকক্ষের সদস্য হবে।

অনেকে বলছে, বর্তমান ব্যবস্থায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে কেউ ইচ্ছামত সংবিধান বদলাতে পারে, ফলে ক্ষমতা নিরংকুশ হয়, ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। বাস্তবতা হলো, বর্তমান ব্যবস্থায় যারা পার্লামেন্টের সদস্য হয়, তাদের দুই তৃতীয়াংশের অধিক সদস্যই সরাসরি ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। উচ্চকক্ষেও এই হার বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং এতে ধনিকশ্রেণির ক্ষমতা ভারসাম্য পরিবর্তন হবে না।

তাহলে কি ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে একটু লাগাম টেনে ধরা যাবে? কোন বৃহৎ দলের একক কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে? মনে হয় না। উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই সংবিধান বদলানো যাবে, সেক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশের প্রয়োজন হবে না। ২০০৮ সালে আওয়ামী মহাজোট কেবল দুই তৃতীয়াংশ আসন পায়নি, তারা একাই পেয়েছিল ৪৮ ভাগের বেশি ভোট। তারা এবং জাতীয় পার্টি এই দুই দল মিলে ৫৫ ভাগের উপরে ভোট পেয়েছিলো। সুতরাং সেসময় উচ্চকক্ষ থাকলেও বিরোধীরা পঞ্চদশ সংশোধনী ঠেকাতে পারত না। তবে হ্যা, বিএনপি কিছু আসন বেশি পেত এই যা!

আবার প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষে কোন বিল একবারের জন্য নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাতে পারবে মাত্র, কিন্তু নিম্নকক্ষে আবারো পাশ হলে সে বিল আটকাবে না। সুতরাং এতে নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল খুব একটা অসুবিধায় পড়বে না। বরং সেই 'বড়' দলগুলো

নিজস্ব স্বার্থে উচ্চকক্ষের বহু লোককে এমপি পদ দিয়ে কিনে নিতে পারবে, কিংবা অনেকে এমপি পদ দলগুলোর কাছ থেকে নির্বাচনের 'ঝামেলা' ছাড়াই কিনে নিতে পারবে। যেহেতু দলগুলো আগে থেকে কোন প্রার্থীতালিকা জনগণকে জানাবে না, সুতরাং এই বিষয়ে জনগণের সম্মতি নেওয়ারও প্রয়োজন নাই।

তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বাইপাস করে, বিভিন্ন গোঁজামিল দিয়ে সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি ভবিষ্যতের জন্য ভালো ফলাফল দেবে না। অথচ সাধারণ কনসেনশাসের ভিত্তিতে সাংবিধানিক পন্থাতেই সংবিধানের নির্বাহী অংশে কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যেত। এর বাইরে কিছু থেকে গেলে রাজনৈতিক দলগুলো ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে নিজ ইশতেহারে সমর্থন লাভ সাপেক্ষে সেটি আদায় করে নিত।

বামপন্থীরা সংস্কার চেয়েছিলো। কিন্তু সংস্কার প্রস্তাবে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর প্ররোচনায় আদর্শিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা ও তা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করাকে বামপন্থীদের জন্য অসম্ভব করে তোলা হয়েছিলো। এখন হ্যাঁ না ভোটে বিভিন্ন ধারা উপধারা যুক্ত করে ঐকমত্যের অংশগুলোকেও সমর্থন করার সুযোগ রাখা হচ্ছে না। ব্যাপারটা এমন, মধু খেতে চাইলে বাধ্যতামূলকভাবে বিষও খেতে হবে! বিষ না খেতে চাইলে না খেয়েই মরো!

(১৩.১১.২০২৫)

গণভোট কেন প্রতারণামূলক?

একটা প্রতারণামূলক গণভোট আমরা দেখছি।

জুলাই সনদের একতরফা ইতিহাসের বয়ান, মূলনীতিসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে গোঁজামিলের জন্য সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে বামপন্থী ৪ দল তাতে স্বাক্ষর করে নাই, যদিও সনদে বর্ণিত উপরিকাঠামোর সংস্কার প্রস্তাবগুলোর প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি বিষয়েই তারা একমত ছিল বা মতামত দিতে বিরত ছিলো। কিন্তু যারা স্বাক্ষর করেছেন, গণভোটের ব্যালট তাদের সাথেও বেঈমানি। একটা সহজ উদাহরণ দেই।

জুলাই সনদে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নোট হিসেবে লেখা আছে, কোন দল যদি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তারা সেইমত সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে। উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রেও একই বিষয়, সনদে স্বাক্ষরকারীরা এই নোটসহই একমত হয়েছে। কিন্তু গণভোটের ব্যালটে উচ্চকক্ষের বিষয়কে আলাদা করে উল্লেখ করে হ্যাঁ বলতে বলা হয়েছে। সুতরাং গণভোটে মানুষ হ্যাঁ বলা হলে বোঝা যাবে ঐ অংশ বাস্তবায়নে জনগণ একমত।

তাহলে কথার কথা, যে দলের ইশতেহারে উচ্চকক্ষের কথা, বা উচ্চকক্ষে পি আরের কথা নাই, জনতা তাদের ম্যান্ডেট দিল, আবার গণভোটে দিল উচ্চকক্ষের পি আর এর পক্ষে, সেক্ষেত্রে কোন অংশকে জনগণের ম্যান্ডেট ধরা হবে? আবার তত্ত্বাবধায়কের বিষয়ে কোন দলই আপত্তি করে নাই, ওকে আবার আলাদা করে ব্যালটের দফায় দেয়া হলো কেন? সেক্ষেত্রে না বিজয়ী হলে কি সনদে উল্লেখিত ঐক্যমত্য নাই হয়ে যাবে?

আসলে গণভোট দিনশেষে এটা ব্ল্যাকমেইলিং। তত্ত্বাবধায়ক চাইলে তোমারে বাকিগুলাও মানতে হবে, সংস্কার চাইলে তোমারে মূলনীতি বদলাইতে হবে, জামাতের মনমতো

উচ্চকক্ষের প্রস্তাব না মানলে বাকিগুলাও হারাইতে হবে, সনদ মানলে সনদের বয়ানের ইতিহাসও মানতে হবে, এই হলো আসল কথা। আর তাদের কথা না মানলে হয়ে যেতে হবে সংস্কারবিরোধী, জুলাই বিরোধী। আবার তাদের মনমতো কথা রাখতে, প্রস্তাবনার সবটা নয়, সামান্য কিছু অংশ (যাতে সচেতন কারোরই আপত্তি থাকার কথা না) নিয়ে আমাদের গাঁটের পয়সায় প্রচার চালাচ্ছে সরকার। আরেকটা ভন্ডামি এইটা।

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রেও এই ব্ল্যাকমেইলিং করা হয়েছিল। সাইন না করলেও বামপন্থীরা কি চায় আর কি চায় না, সেখানেই লেখা আছে। সুতরাং জোর কণ্ঠে বামদের সংস্কারবিরোধী ট্যাগ দিয়ে লাভ নাই। বামপন্থীরা নৈতিক জায়গা থেকেই এই গোঁজামিলের সংস্কার প্রক্রিয়ার ত্রুটি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে থাকবে।

(২৯.০১.২০২৬)

ইন্টেরিমকাল শেষে নির্বাচনের প্রতীক্ষা

ইতিহাসের এক দিক নির্ধারণমূলক বাঁকে দাঁড়িয়ে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বছর দেড়েক আগের '২৪-এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের যে পটভূমিতে এ নির্বাচন হতে চলেছে। গণঅভ্যুত্থান ও এর পরবর্তী নানা ঘটনাপ্রবাহের কারণে এই নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি এক গভীর সম্ভাবনা ও সংকটের যুগসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেছিল। দীর্ঘদিনের ফ্যাসিস্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্বৈরাচারী কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের মরণপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল। সেই সরকারের পতন হয়েছে, তার শাসনের অবসান হয়েছে। শেখ হাসিনার এই শাসনামলকে বিভিন্ন গবেষণায় 'ফ্যাসিস্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনতুষ্টিবাদী কর্তৃত্ববাদের নয়া উপনিবেশিক রূপ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই শাসনের পতনের পর রাষ্ট্রক্ষমতা কোন পথে অগ্রসর হলো? আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, জনগণের রক্ত ও আত্মত্যাগে অর্জিত এই গণঅভ্যুত্থান দ্রুতই সিভিল-মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি ও পশ্চিম অনুগত ধনিক শ্রেণির অভিজাতগোষ্ঠীর খপ্পরে পড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে একে হয়তো একসময় 'উগ্র দক্ষিণপন্থী জনতুষ্টিবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির সহায়তায় পশ্চিমা শক্তি সমর্থিত নয়া উদারবাদী অন্তর্বর্তী অভিজাততন্ত্র' হিসেবেই চিহ্নিত করা হবে। বস্তুতঃ এই শাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো এদেশে নয়া উপনিবেশিক ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

ইতিহাস একথা বলে যে- যে কোনো দীর্ঘস্থায়ী কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে আগে পরে যে কোন সময় গণবিস্ফোরণ ঘটাটা অবশ্যম্ভাবি। কিন্তু সেই গণবিস্ফোরণের পর রাজনৈতিক

প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো দুর্বল থাকলে, সেই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া উদারবাদী শক্তির দুরভিসন্ধিমূলক হস্তক্ষেপের সুযোগ তদানুপাতে কম বেশি হয়। একারণেই নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এক নয়; আবার ইরাক, আফগানিস্তান বা ইউক্রেনের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও বাংলাদেশের বাস্তবতাকে হুবহু মেলানো যাবে না। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা একটি স্বতন্ত্র বাস্তবতা- যাকে কোন একটি নির্দিষ্ট ছকে ফেলে ব্যাখ্যা করলে গণঅভ্যুত্থান ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বহুমাত্রিকতা বোঝা যাবে না। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও কর্তাসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, জনগণের সাথে কায়েমি স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহের বাস্তব দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলোকে পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমেই এই অস্থির সময়ের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

আমরা দেখেছি গণঅভ্যুত্থানের পর পরই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়েছিল জনগণের সক্রিয় ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেই। এমনকি শেখ হাসিনা দেশত্যাগের আগেই পশ্চিমা সমর্থিত অলিগার্কি ও দক্ষিণপন্থী শক্তির অক্ষ রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে। গণআন্দোলনের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রকে একটি তথাকথিত "মেটিকুলাস ডিজাইন তত্ত্ব"-এর কাঠামোতে আবদ্ধ করে তার সমস্ত কৃতিত্ব গুটিকয়েক মানুষের হাতে যেভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল, তা ছিল এই দখল পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যেই। পরিনতিতে, গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত নায়ক- জনগণ ও তাদের বৈষম্যবিলোপের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা- ধীরে ধীরে রাজনৈতিক বয়ান থেকে মুছে যেতে থাকে। পরাজিত বা বিতাড়িত শক্তিগুলোও অপরাধ-ভুল স্বীকার না করে নিজেদেরকে নিছক 'ষড়যন্ত্রের শিকার' হিসেবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে এই 'মেটিকুলাস ডিজাইনের' বয়ানকে সমর্থন করে। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে গুটিকয়েকের সম্মতিকেই "গণসম্মতি" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ছক অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করে।

ক্ষমতা সংহত করার সাথে সাথেই শাসকশ্রেণি উগ্র দক্ষিণপন্থা ও মববাজি-মাস্তানিকে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় দিতে শুরু করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কার্যত অকার্যকর করে রাজনীতির গতিমুখকে পশ্চিমা-প্রতিক্রিয়াশীলতা অভিমুখী করে ফেলা হয়। পরিবর্তনকামী জনগণকে বিভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত ও বিভাজিত করে সংস্কারের নামে রাষ্ট্রকে শুধু লুটেরা পুঁজিবাদের পুরনো নয়া উদারবাদী মডেলের একটি আপডেটেড রক্ষনশীল সংস্করণে রূপান্তর করাই নয়, তাকে চরম দক্ষিণপন্থা ও উগ্র সাম্প্রদায়িক অন্ধকারে টেনে নামানোর অপচেষ্টা শুরু হয়।

উপরিকাঠামোকেন্দ্রিক কিছু সংস্কারের তর্কে রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যস্ত রেখে দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়। জনগণের দৈনন্দিন জীবনসংক্রান্ত প্রশ্ন- দাম, মজুরি, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি পাশ কাটিয়ে এই অলিগার্কি নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। জনগনের অগোচরে অতি সংগেপনে চুপচাপ করে বন্দর ইজারা দেওয়া হয় পশ্চিমা শক্তির হাতে। এ যেন নাওমি ক্লেইনের শক ডক্ট্রিন তত্ত্বের আরেকটি ক্লাসিক উদাহরণ-সংকটকে পুঁজি করে নয়া উপনিবেশিক নীতি চাপিয়ে দেওয়া।

এই সময় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সৃষ্ট ন্যায্য ভারতবিরোধী ক্ষোভকে সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষমূলক রূপ দেওয়া হয়। ভারতের অন্যায্য আধিপত্যবাদী আচরণের কারণে মানুষের মাঝে যে ক্ষোভ জন্ম রয়েছে তাকে ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজনের ভাষায় উপস্থাপন করা হতে থাকে। এতে লাভবান হয় উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য ভারতের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করা নয়; উদ্দেশ্য হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের ভূরাজনৈতিক কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ভারতকে "লাইনে" রাখা। ফলে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য ক্ষোভকেও এ ধরনের নানা পক্ষ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে সচ্ছেষ্ট হয়। এই সুযোগে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের গতিমুখকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে সচেষ্ট হয়। সেই ধারাতেই হামলা চালানো হলো প্রথম আলো, ডেইলি স্টারের মত পত্রিকায়, উদীচী-ছায়ানটের মত প্রতিষ্ঠানে।

উগ্র দক্ষিণপন্থার এই উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার তৎপরতা জোরদার করেছে। পশ্চিমা শক্তির প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র ও মুক্তবাজারবিরোধী সকল ধারাকে অপসারণ করা। এদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও চরম দক্ষিণপন্থীদের একটি মুল লক্ষ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের নাম নিশানা সংবিধান থেকে মুছে ফেলা। এই দুই শক্তি এখানে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। একদিকে পুজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদের 'নয়া উদারবাদী নয়া উপনিবেশবাদ', অন্যদিকে 'সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ'– দুটিই গণঅভ্যুত্থানের অর্জনকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর।

এই নাজুক ও সংঘাতপূর্ণ বাস্তবতায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে কে বা কারা সরকার গঠন করবে কেবল সেটিই নির্ধারিত হবে না, একই সাথে বহুলাংশে নির্ধারিত হবে যে রাষ্ট্র ভবিষ্যতে কোন পথে যাবে। এ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে তা নিরসনে মরিয়া প্রচেষ্টা পরিস্থিতিকে কঠিন করে তুলেছে। পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গভীর ষড়যন্ত্রমূলক নানা সক্রিয় তৎপরতা। অনির্বাচিত সরকার ও অস্থিতিশীলতা-অনিশ্চয়তা বজায় রাখতে পারলে তাদের ষড়যন্ত্র করতে সুবিধা হয়। তাই তারা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টিতে সচেষ্ট। এ নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অবাধ-নিরপেক্ষ-গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকে তার প্রধান কাজ বলে গন্য না করে একটি বিতর্কিত প্রশ্নবিদ্ধ ও প্রতারণাপূর্ণ হ্যাঁ-না ভোটকে সামনে নিয়ে এসেছে। এভাবে তার মূল দায়িত্ব পালন না করে নানা অযুহাতে অনির্বাচিত সরকারের মেয়াদ দীর্ঘায়িত করেছে। সরকার নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি ও এখতিয়ার-এর বাইরে গিয়ে তার ম্যান্ডেট লঙ্ঘন কররে রাষ্ট্রীয় খরচে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। অথচ এই হ্যাঁ-না ভোটের বিষয়বস্তু জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়। ভোটের বিষয়বস্তু নিয়ে, এবং ভিন্নমতের বিষয়গুলোকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছলচাতুরী করা হয়েছে। জনগণের সামনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃত সংস্কার-প্রস্তাব হাজির না করে, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে হয় মেনে নেওয়া আর তা না হলে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেওয়া-এই দুইয়ের মধ্যে বেছে নিতে জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে। জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্টে আলাপ আলোচনা না করে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া প্রশ্নে গণভোট এবং সেক্ষেত্রে 'হ্যাঁ'-কে বিজয়ী করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা নেওয়া কোনভাবেই গণতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

দেশের মানুষ স্বৈরাচারী হাসিনার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে গণতন্ত্র ও প্রগতির পথে আরোও সামনের দিক এগুনোর জন্য। পেছনের দিকে যাওয়ার জন্য নয়। গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী গণমানুষের গণআকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিলো বৈষম্য বিরোধিতা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্লোগানে। গ্রাফিতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো বহুত্ববাদী অসাম্প্রদায়িক সাম্যের সমাজের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেনি, বরং এই গণ অভ্যুত্থানকে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে স্থাপন করার চক্রান্তের পথ করে দিয়েছে। আজ দেশবাসীর সামনে একটি প্রধান দায়িত্ব হলো বাংলাদেশকে এই উগ্র দক্ষিণপন্থা ও পশ্চিমা

মদদপুষ্ট অলিগার্কির হাত থেকে উদ্ধার করা। তবে মনে রাখতে হবে এই লড়াই কেবল এই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধেই নয়; এই লড়াই নয়া উপনিবেশিক শক্তিগুলোর মদদে পরিচালিত নানা চেহারার ফ্যাসিবাদী- গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামেরই অংশ। নির্বাচনের আগে যেমন, নির্বাচনের পরেও গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামকে দৃঢ়তার সাথেই অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

০২.০২.২৬